তোওকিওর দুর্গোৎসবের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে

স্মৃতির পাতা থেকে

- সুদেব চট্টোপাধ্যায়

তোওকিওতে দুর্গাপুজো আমরা আরম্ভ করি ১৯৯০ সালে । অবশ্য তার আগে অনেকদিন থেকেই তোওকিওবাসীরা, বিশেষকরে দিদি-বউদিরা, প্রধানত শিউলিবউদি এবং মঞ্জুলিকাদি আমাকে

ধরেছিলেন দুর্গাপুজোর পৌরোহিত্য করতে। ১৯৮১ সাল থেকে আমি তোওকিওতে সরস্বতী পুজো আরম্ভ করি, তাই দিদি-বউদিদের বক্তব্য ছিল, সরস্বতী পুজো করছই যখন দুর্গাপুজোয় এত আপত্তি কেন । আসলে নিজস্ব কুসংস্কারের জন্যই আমি মন ঠিক করে উঠতে পারিনি বেশ কিছু দিন । আমাদের কলকাতার বাড়িতে বাবা নিয়মিত দুর্গাপুজো করতেন, তাই পূজাপদ্ধতি অজানা ছিল তা নয় । আমদের বাড়ীতে পূর্বপুরুষের মতামত অনুযায়ী বারোয়ারি

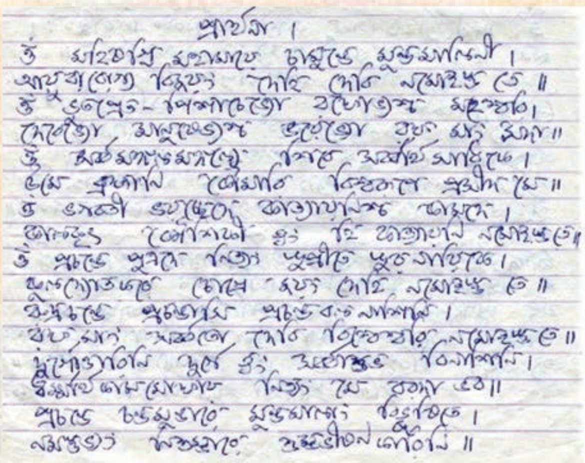

পুজোর পৌরোহিত্য করা বারণ ছিল । সেটাই ছিল আমার প্রধান সমস্যা । আমিও তাই বউদিদের আবেদনে চট করে সম্মতি দিতে পারিনি । বছর দুয়েক সময় লেগেছে বাড়ীর মত পাল্টাতে, বিশেষ করে আমার মাকে বোঝাতে । শেষপর্যন্ত মা-ই আমাকে পুরোহিত দর্পণ থেকে মন্ত্র হাতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। আজও আমি সেই মার হাতের লেখা মন্ত্র পড়ে পুজো করি। এবছর আমার মা চলে গিয়েছেন আমাদের ছেড়ে তাই এবার আমি পুজো করতে পারব না, মার কথা মনে করেই কাটবে ঐদিন।

শরৎকাল জাপানেও অনেক উৎসবের সময়, তাই প্রথম অসুবিধে হয় হল ভাড়া করা নিয়ে । তিন থেকে ছয় মাস আগে থেকে ব্যাবস্থা না করলে উপায় নেই, তাও আবার লটারি জিততে হবে, তবেই পাওয়া যাবে এক দিন হল ব্যাবহার করার অনুমতি । এ ব্যাপারটা অবশ্য আমি এখন পুরোপুরি আমার স্ত্রী কেইকোর উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং প্রতিবছর এই কঠিন কাজটা ওকেই সামলাতে হয়। দ্বিতীয় সমস্যা হল প্রদীপ জাতীয় আগুনের ব্যাবহার। প্রথমদিকে আমরা ধূপধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করতাম, কারণ অনেক হলে তখনও কানশি-ক্যামেরা অর্থাৎ হলের ভিতরে আমরা কি করছি না করছি সবকিছুই হলের ম্যানেজাররা তাদের অফিসে বসে দেখার ব্যাবস্থা ছিল না । আসলে ধূপধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করতে গেলে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী দমকলকে আগে থেকে খবর দেয়া দরকার। তাদের অনুমতি ছাড়া আগুন জালানো একদম বারণ, এবং সেই অনুমতি পাওয়াও অনেক ঝামেলা। শেষপর্যন্ত এই আগুন জ্বালানোর ব্যাপারটা আমাদের এখন পুরোপুরি বাদ দিতে হয়েছে, পুজোর ব্যাপারে এটাই আমার একমাত্র আফশোষ।

আমাদের প্রথম দুর্গাপুজো হয় ওতা-কুর মিনেমাচি বুঙ্কাকাইকান হলে । এই হলে আমরা তখন নিয়মিত সরস্বতী পুজো করতাম তাই জায়গাটা অনেকেরই পরিচিত ছিল । সেজন্যই এই হলটাতেই দুর্গাপুজো-সঙ্ক্রান্ত আমাদের লটারির ভাগ্য প্রথম পরীক্ষা করেছিলাম । ভগবানের ইচ্ছেয় যেদিন আমরা পুজো করতে চেয়েছিলাম সেদিনই পাওয়া গিয়েছিল হল ব্যাবহারের অনুমতি। এই হলটার আরেকটা সুবিধে ছিল রান্না করার জায়গা। প্রথমদিকে দিদি-বউদিরা দুপুরের খাবার নিজেরাই রান্না করতেন, তাই রান্নার জায়গাটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । এখন অবশ্য এ ব্যাপারটা ক্যাটারারের হাতে ছেড়ে দেওয়াতে রান্নার জায়গা আর দরকার হয় না । আমার মনে হয় এ পর্যন্ত পুজোর হলের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ছিল শিনাগাওা-কুর ওইমাচি ক্যুরিয়ান এক্সহিবিশন হল। JR ওইমাচি স্টেশনের ঠিক উপরেই অবস্থিত বেশ বড় এই হলের প্রধান আকর্ষণ ছিল ট্রেনে যাতায়াতের সুবিধে। সেই কারণেই বোধহয় সে বছর সব মিলে প্রায় সাড়ে চারশ লোক আমাদের পুজোয় যোগদান করেছিলেন। এই হলটাও এক বছর আগে থেকে আয়োজন না করলে পাওয়া যায় না এবং খালি শিনাগাওা-কুর লোকেরাই লটারিতে যোগদান করতে পারেন। আমি থাকি ওতা-কুতে কাজেই আমি লটারিতে যোগদান করতে পারিনি। সেবছর পুজোর দিন প্রথমে যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন, কোন কারণে তাকে ক্যান্সেল করতে হয় এবং তার পরিবর্তে ঠাকুরের ইচ্ছেতেই আমরা হলটা ভাড়া নিতে পারি। সেই বছরের পুজোর কথা এখনও অনেকের মনে আছে এবং তারা অনেকেই এই হল সম্বন্ধে প্রতি বছর আমাদের জিজ্ঞেস করেন।

আমাদের প্রথম পুজোর ঠাকুর ছিল ফ্রেমে বাঁধানো ছবি । তখন বাঙ্গালী লোকসংখ্যাও কম ছিল তাই আমাদের আর্থিক সামর্থ্যও ছিল পরিমিত। আরেকটা অসুবিধে হল কলকাতার মতন এখানে নদীতে ঠাকুরকে বিসর্জন দেওয়া যায় না । শেষপর্যন্ত আমার বাড়িতে রাখার কথা ভেবেই ছবির ঠাকুর ব্যাবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বেড়েছে, আমাদের পুজো-সঙ্ক্রান্ত

আয়ব্যায়ের পরিমাণও বেড়েছে সেইসঙ্গে। এখন প্রতি পাঁচ-ছ বছর অন্তর নতুন প্রতিমা আনা হয় কলকাতা থেকে। প্রথমে সেই প্রতিমা কারুর গ্যারাজে রাখা হত। এখন প্রতিমা ট্রাঙ্করুম ভাড়া করে রাখা হয়। সেইজন্য দরকার হয় হাল্কা এবং মজবুত বাক্সর। এই বাক্স

এখন নতুন ঠাকুর এলে জাপানেই তৈরি করা হয়। গত বছর প্রায় ছয় বছর পরে এ পর্যন্ত আনানো প্রতিমার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিমা আনানো হয়েছে। সেই প্রতিমাই এবার পুজো করা হবে। বিসর্জন দেওয়া যায়না বলে এ পর্যন্ত ব্যবহার করা পুরানো প্রতিমাগুলি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এক জাপানীর ভারত-সঙ্ক্রান্ত মিউজিয়ামে রাখা আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে আমাদের দুর্গোৎসবের ইতিহাসের খোঁজ নেওয়া যায়।

পুজোর অন্যান্য আকর্ষণ বলতে কালচারাল প্রোগ্রাম। প্রথমদিকে তোওকিওবাসী বাঙ্গালীরাই গান, নাচ, নাটক ইত্যাদির আয়োজন করতেন নিজেদের আনন্দের জন্য। সব কিছুতেই একটা ঘরোয়া পরিবেশ ছিল। এখন অবশ্য সেই পরিবেশ বেশ কিছুই পাল্টেছে। স্টেজের এলাহি আলোর ব্যাবস্থা, উন্নত সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি না থাকলে আজকাল মনস্তুষ্টি হয় না, বাইরে থেকে নামকরা গ্রুপকে ডাকতে হলে এ ছাড়া উপায়ও নেই । আজকাল আর একটা বড় আকর্ষণ হচ্ছে ভারত সরকার এবং নমস্তে ইন্ডিয়ার যুক্ত-প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত প্রতি বছর বিভিন্ন গ্রুপের লোকনৃত্য। সেদিক থেকে বলতে গেলে গত বছর সবচেয়ে ভাল হলের আয়োজন করা গিয়েছিল। আশা করছি এবারের হল গতবারের তুলনায় আরও ভাল হবে।

দুর্গাপুজো নিয়ে বলতে গেলে আমাদের শারদীয় পত্রিকা অঞ্জলির কথা না বলে শেষ করা যাবে না। আমরা অঞ্জলি প্রকাশ আরম্ভ করি উনিশ বছর আগে থেকে। এই পত্রিকার বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, জাপানী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পড়ে জাপানের বাইরের পাঠকেরাও আজকাল নিয়মিত আনন্দ উপভোগ করেন। আমরাও চেষ্টা করি এই পত্রিকার সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপারেও অঞ্জলি এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রথমে আমরা আরম্ভ করেছিলাম সাদাকালো প্রিন্টে, এখন প্রায় পুরোপুরি রঙিন প্রিন্টে প্রকাশ করা হচ্ছে গত দু বছর হল। এটাই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবমিলে আমরা তোওকিওবাসী বাঙ্গালীরা চেষ্টা করে চলেছি দুর্গোৎসবে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের যথাসম্ভব আনন্দ দিতে। ঘরোয়া পরিবেশের বারোয়ারী পুজো এই আমাদের ট্র্যাডিশন হয়ে উঠেছে। আশা করি ঠাকুরের ইচ্ছেয় সেই ট্র্যাডিশন সমানেই চলবে। ■

লহ প্রণাম

স্বর্গীয় ডঃ ৎসুয়োশি নারা
(জন্ম ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩২ মৃত্যু ২০শে জানুয়ারী ২০১৪)

জাপানের বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ও বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ ডঃ ৎসুয়োশি নারা ২০শে জানুয়ারী আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন । জাপান ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচনায় তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত । তিনি ১৯৫৮ সালে প্রথমবার ভারতে যান ইন্দোআর্য ভাষা নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে । তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যক্ষ ছিলেন ভারতের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ খয়রা অধ্যাপক ড: সুকুমার সেন । তাঁর কাছেই ড: নারা নিয়েছেন বাংলা ভাষাতত্ত্বের পাঠ, আর শিখেছেন অবহট্ঠ দোঁহা । ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর রচনা করেছেন অজস্র বই ও গবেষণাপত্র, যার মধ্যে Avahatta & Comparative Vocabulary of New Indo-Aryan শিরোনামের বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চর্চা করেছেন দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ভাষাও । খাসি, মুন্ডা ও সাঁওতালি ভাষা যে ভাগের অন্তর্ভুক্ত সেই অস্ট্রোএশিয়াটিক এবং হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন । কাজ করেছেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত কয়েকটি ভাষা নিয়েও । ভারতীয় ভাষার অক্ষরের জন্ম এবং বিবর্তনের ইতিহাস নথিবদ্ধ করেছেন এবং তারই সূত্র ধরে মনিপুরি ভাষার নিজস্ব অক্ষরের পুনর্জন্ম ও পুনর্ব্যবহার শুরু হয় ।

ড: নারার কর্মময় জীবনে সাফল্য ও অর্জনের তালিকাটি বিরাট, স্বল্প পরিসরে যার সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয় । ভাষাতত্ত্বে পাণ্ডিত্য ছাড়াও, আধ্যাত্মিকতার অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন তিনি । সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের সংকল্পে অবিচলিত থেকে নিজের জীবনে ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন । এর অন্যতম দৃষ্টান্ত জাপানের রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক । ড: নারার জীবন এক নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিচ্ছবি । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । বহু অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননায় ভূষিত করে । সে বছরই জাপান সরকার তাঁকে Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon দিয়ে সম্মানিত করে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদানে তাঁর বহুদিনের অবদানের জন্য ।

ড: ৎসুয়োশি নারাকে আমি সম্বোধন করতাম নারা সেনসেই বলে । ১৯৮৩ সালে জাপানে আসার পর নারা সেনসেই-এর সাথে চাক্ষুষ সাক্ষাত হলেও, আমার ননদাই শ্রী কল্যাণ দাশগুপ্তর সাথে তাঁর বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্র ধরে সেনসেই-এর নাম আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি । অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়াও জেনেছি তাঁর পরোপকারী মহৎ হৃদয়ের কথা । প্রথম আলাপের দিন থেকে তিনি আমার কাছে এক অপরিসীম আনন্দের প্রতীক হয়ে থেকেছেন । পরে বুঝেছি তাঁর শান্ত সমাহিত আনন্দময় ব্যক্তিত্বের উৎস প্রোথিত ছিল মহৎ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মধ্যে । আমাদের পরিবারে নারা সেনসেই-এর ভূমিকা ছিল অভিভাবকের মত । যত দিন গেছে আমরাও ধীরে ধীরে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছি নারা পরিবারের একান্ত আপনজনের তালিকায় । সবসময় ওনার কাছ থেকে পেয়েছি মূল্যবান উপদেশ । জীবনে চলার পথে দুঃসহ সময়কে পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি ওনারই সহায়তায় ।

২০০৪ সালে আমাদের পরিবারে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে । সেই শোকে আমরা যখন মূহ্যমান, মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তখন সেনসেই আমাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন । সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা । সে সময় সেনসেই-এর শেখানো মন্ত্র আজও আমি প্রাত্যহিক পূজার সময় উচ্চারণ করি ।

মনে পড়ে বেশ কিছু বছর আগে "অঞ্জলি" পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর হয়ে গিয়েছিলাম নারা সেনসেই-এর একটি সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য। সেনসেই-এর অফিস ঘরে বসে সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিলাম ওনার প্রথম ভারত ভ্রমণের বিবরণ । ভারতে পা দিয়েই সেনসেই-এর মনে হয়েছিল এ জায়গার সাথে ওনার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষকেই কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। সামগ্রিকভাবে নারা সেনসেই-এর জীবন ও কর্মকাণ্ডে এক ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বশান্তিকামী চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে পার্থিব জীবনে নারা সেনসেই-এর সান্নিধ্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলাম । আজ মনে হচ্ছে উনি যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন সেই সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে পারিনি । ওনার কাছ থেকে যা কিছু শিখে নেওয়া বা জেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিছুই করা হয়নি । তবে সেনসেই নিজের জীবনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা আমাদের সকলকে পথের দিশা দেবে বলে আমার বিশ্বাস । তাঁর প্রদর্শিত পথ কিছুটাও যদি অনুসরণ করতে পারি, সেনসেই-এর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভবপর হবে ।

আজ নারা সেনসেই-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর জীবনদর্শনের যে মূলমন্ত্রটি আমাকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করেছে, তা অল্প কথায় বলার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে চাই ---

"যত দিন রাখো তোমা মুখ চাহি
ফুল্লমনে রব এ সংসারে ।
ডাকিবে যখনই তোমার সেবকে
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সংসারে" ।।

আজীবন কর্মব্যস্ত ও সদা আনন্দময় নারা সেনসেই-এর সার্বিক জীবন ও শেষ যাত্রা যেন এই কথাগুলিরই বাস্তবায়িত রূপ ।

সেনসেই আপনাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ।

- রুমা গুপ্ত

নারা সেনসেই ও আন্তর্জাতিক বঙ্গ বিদ্যা সম্মেলন

- মাসাহিকো তোগাওয়া

নারা সেনসেইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমি যখন সবে আমার মাস্টার্সের পড়া শুরু করেছি। ১৯৮৯ সালে ওনার গ্রীষ্মকালীন বাংলাভাষার ক্লাশে অংশ নিয়েছিলাম । হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথামৃতের অনুবাদকরূপে এবং জাপানের ইসকন মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয়দাতা হিসেবে ওনার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। কিন্তু বই পড়ে ওনার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, সাক্ষাতে সেই ধারণা একদম বদলে গেল। আসলে উনি খুবই সাধারণ প্রকৃতির স্নেহশীল, অমায়িক ও মার্জিত মানুষ ছিলেন।

তারপর ১৯৯২ সালে আমি যখন কলকাতায় পড়তে যাই, তখন নারা সেনসেই আমাকে বলেছিলেন “ভারতবর্ষে গেলে টাকা ধার করেও যতটা সম্ভব বই কিনে আনবে।” এই আধুনিক ইন্টারনেটের যুগেও নারা সেনসেইয়ের এই বাণী খুবই মূল্যবান বলে আমি মনে করি।

আমি যখন কলকাতায় পড়াশুনা করছি, একদিন কী মনে করে নারা সেনসেই কবে কলকাতায় আসবেন তা জানবার জন্য কলকাতাবাসী আরেকজন জাপানী ছাত্রের সঙ্গে আই.এস.আই.-এর গেস্টহাউজে যাই। গিয়ে দেখি নারা সেনসেই সেদিন সকালেই কলকাতা এসে পৌঁছেছেন। আমাদের দেখে খুব একটা বিস্মিত না হয়েই তিনি বললেন “আমার ফ্লাইটের তারিখ হঠাৎ বদলে-যাওয়াটা তোমরা বেশ বুঝতে পারলে তো!” ওনার সঙ্গে যেন আগে থেকে সাক্ষাতের কথা ঠিক ছিল। আমার মনে হয় যেন আমি ওনার মনের ডাকে সেখানে গিয়েছিলাম। নারা সেনসেইয়ের সঙ্গে এরকম মনের টান কয়েকবারই আমার ঘটেছিল।

আমার পুরনো বন্ধু আকিয়োশি হিরোৎসু একজন আলোকচিত্র শিল্পী । আমরা নারা সেনসেইয়ের কাছে একসঙ্গে বাংলাভাষা পড়েছি। হিরোৎসু কলকাতা শহরের উপর একটা ছবির বই বের করেন এবং তাঁর অনুরোধে নারা সেনসেই তাতে বাঙালি সংস্কৃতি, মনন, বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখেন। বন্ধুর অনুরোধে আমাকেও সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতে হয়েছিল। বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন নারা সেনসেই রাজপ্রাসাদে জাপানের সম্রাটের কাছে বইটি দেখাতে নিয়ে যান। পরে উনি ফোনে জানালেন “আজ সম্রাটের কাছে গিয়ে কলকাতা বইটি দেখিয়ে এসেছি।” এমন একটা সম্মানজনক ঘটনা, কিন্তু সেনসেই এত সহজভাবে বললেন যেন খুব কাছের কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে এসেছেন। এইভাবে যে কোনো বিশেষ ঘটনাও নারা সেনসেই সহজভাবে প্রকাশ করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর নারা সেনসেইএর কাছে অনেকে আধ্যাত্মিক উপদেশ নেবার জন্য আসতেন বলে শুনেছি। তাই পরের দিকে সম্মেলনে ওনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগও কমে এসেছিল।

২০১০ সালে দিল্লিতে আয়োজিত ১ম বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে নারা সেনসেইয়ের উপস্থিতির কথা না জেনে আমি পরিচিত একজনের আহ্বানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রবন্ধ পড়ার দিন সকালে আমি যখন হোটেলের ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। সেটা নারা সেনসেইয়ের ফোন ছিল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন “আর কিছুক্ষণ পরে তো তোমার পেপার পাঠ আছে। প্রস্তুত তো?” ওনার ফোন পেয়ে আমি খুবই অবাক হই।

এই সম্মেলনে আর একটি ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সেটা হলো, অন্তিমদিনের মিটিংয়ে নারা সেনসেইকে এই আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়। বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের বাংলা গবেষকদের উদ্যোগে এই প্রথম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন বাস্তবায়িত হয়, আর তার প্রথম সভাপতি পদে জাপানের নারা সেনসেইকে অভিষিক্ত করা হলো----এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা বলে আমি মনে করি।

তারপর এই বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন নারা সেনসেইয়ের মহান নেতৃত্বে ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়। এই সম্মেলন বিশ্বব্যাপী বাংলা গবেষকদের মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সম্মেলনে তর্ক ও গল্পপ্রিয় বাঙ্গালি, যাঁরা একবার কথা শুরু করলে সহজে থামতে চান না, তাঁদের সামনে ধীরস্থির নম্রভাবে আলোচনারত নারা সেনসেইকে দেখে আমি জীবনের শিক্ষালাভ করেছিলাম। এই সম্মেলনে নারা সেনসেইয়ের সান্নিধ্যে আসতে পেরে আমার মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় আয়োজিত বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নারা সেনসেই সম্মেলনের সভাপতি রূপে আরও ১০ জন বিশেষ অতিথির সঙ্গে মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন । কিন্তু মঞ্চে উপবিষ্ট সকলে একজন একজন করে ভাষণ দিতে শুরু করলে নির্ধারিত সময় দুপুর ১২টা পেরিয়ে দেড়টা বেজে গেল । তখনও সবার বলা শেষ হয়নি । এদিকে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে যাঁদের বলা হয়ে গেছে তাঁরা ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে মধ্যাহ্ন ভোজনে যেতে শুরু করলেন । ক্রমশঃ শ্রোতারাও একজন একজন করে উঠতে শুরু করলেন । আয়োজকরাও ধৈর্য্য হারিয়ে এক এক জন করে উঠে খেতে চলে গেলেন । মঞ্চের উপর নারা সেনসেইকে নিয়ে শুধু মাত্র ৩ জন রয়ে গেলেন । দূর জাপান থেকে আগত নারা সেনসেই-এর শারীরিক ক্লান্তি ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আমি ওঁকে মঞ্চের পর্দার পেছন থেকে বললাম, “আর কেউ নেই । চলুন, খেয়ে আসবেন”। কিন্তু নারা সেনসেই বললেন, “আমি এখান থেকে উঠে গেলে, ভাষণ শোনার কেউ থাকবে না”। শেষ জনের বলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি মঞ্চের উপরেই ছিলেন ।

১৯৫৮ সালে নারা সেনসেইয়ের সঙ্গে এক জাহাজে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন নাগা কোকি। তিনি সর্বোদয় পত্রিকায় নারা সেনসেইয়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, জীবনের শেষদিকে নারা সেনসেই জাপানীর বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বনাগরিক হয়ে জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবেন, সেই চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন। সেইজন্য পরবর্তী আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনটা জাপানে আয়োজন করার জন্য আগ্রহী ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর অনুসারীদের পরবর্তী সম্মেলনের জন্য নানাভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

শেষে আরেকটা ঘটনা লিখেই আজ শেষ করব।

২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন জাপানে আসেন, তখন প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় হিরোশিমা আসেন পিস মিউজিয়াম ও পিস পার্ক দেখতে। নারা সেনসেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং নিজের পরিচিত হিরোশিমার নাগরিকদের ডেকে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সংবর্ধনাসভার আয়োজন করেছিলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ওসাকাতে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা থাকার কারণে, মিউজিয়াম দেখার পরই ওসাকা চলে যাবার কথা। কিন্তু নারা সেনসেইয়ের আমন্ত্রণে তিনি পরিকল্পনা বদলে সংবর্ধনাসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাতে সরকারি কর্মকর্তাগণ খুবই অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে আর হিরোশিমার ওকোনোমিয়াকি খেয়ে তৃপ্তিবোধ করেছিলেন। নারা সেনসেইয়ের মধ্যে এইরকম এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। ■

ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

বছর শুরু হতেই চলে গেলেন নারা সেনসেই -- ডঃ ৎসুয়োশি নারা । আমরা হারালাম একজন বাংলা প্রেমী তথা ভারত বন্ধু । খবরটা পেয়ে অবধি কত স্মৃতিই যে ঘুরে ফিরে আসছে । মনে হচ্ছে এই তো সেদিন কলকাতাতে সেনসেই-এর সঙ্গে আলাপ হোল । আসলে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই ১৯৬১ সালের কোনও এক সময় । সময়টা আজ আর মনে পড়েনা । তবে এইটুকু মনে আছে যে আমি তখন এম. এ পড়ি বাংলা নিয়ে আর উনি ডঃ সুকুমার সেনের কাছে বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন বা শেষ করেছেন । থাকতেন গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্টহাউসে । পরিচয় হওয়ার আগেই ওঁর কথা শুনেছিলাম । একজন বিদেশী বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন জেনে বাংলা ভাষার ছাত্রী হিসাবে যথেষ্ট কৌতূহল আর আগ্রহ ছিল ওঁর সম্বন্ধে । কিন্তু তখন এখনকার মতন অচেনা কারোর সঙ্গে হুটহাট করে দেখা করা বা আলাপ করার সুযোগ ছিলনা আমাদের । কাজেই ওই শোনার মধ্যেই সব ইচ্ছা সীমাবদ্ধ ছিল । এর কিছুদিন পরে কোনও কারণে আমার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছিল । সে সময় গেস্টহাউসে কারোর সঙ্গে দেখা করতে হলে গেটের দারোয়ানদের কাছে অনেক জবাবদিহি করতে হোত বিশেষ করে দর্শনার্থী যদি কম বয়সী মেয়ে হোত । তারা সন্তুষ্ট হলে তবেই খাতায় সই করে ভিতরে ঢোকার অনুমতি মিলতো । যাইহোক, সব ঝামেলা পেরিয়ে ওঁর ঘরের দরজায় বেল বাজালাম । মনে মনে তখন গুরুগম্ভীর চেহারার এক ভদ্রলোকের ছবি আঁকতে আঁকতে নানান চিন্তার ভিড় মাথায় জমছে । বেশ অস্বস্তি বোধ করছি । নার্ভাসও লাগছে । একে বিদেশী তায় সম্পূর্ণ অচেনা । কি জানি কীভাবে নেবেন আমার এই বিনা নোটিশে হঠাৎ আসাটা ।

তখন বাড়ীতে বাড়ীতে এত ফোন ছিলনা ---আমাদেরও ছিলনা । আর খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসাটাই রীতি ছিল । তার জন্য কেউ কিছু মনে করতেন না । অবশ্য খোঁজখবর করে ফোন করাটা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলনা । কিন্তু সে সব করতে যাবার মতন সময়ও ছিলনা । তাছাড়া একটা ভয়, একটা সংকোচ মনের মধ্যে ছিল আর সেই সঙ্গে ছিল অধীর উত্তেজনা আর আগ্রহ ---যার কথা এতদিন শুনেছি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, পরিচয় হবে । যাইহোক, মাথা ভরা হাজারটা চিন্তা নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তো আছি, অথচ দরজা আর খোলেনা ! ঘরে আছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত । কারণ বেল বাজানোর পরে সাড়া পেয়েছি । আমার উৎকণ্ঠা যখন চরমে উঠেছে, অধৈর্য্য হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছি, তখনই শুনি কেউ বলছেন, “ক্ষমা করবেন, অনেকক্ষণ আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি”।

বাংলা কথা শুনে ফিরে তাকাই । দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে দেরি করার জন্য যিনি ক্ষমা চাইছেন, তাঁকে দেখে আমি আমার চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা । কোথায় গুরুগম্ভীর চেহারা ? আমার কল্পনাকে ভেঙেচুরে সামনে দাঁড়িয়ে রোগা মতন ছোটোখাটো চেহারার অল্প বয়সী এক ভদ্রলোক । বয়স বোধহয় ত্রিশের কোঠাতেও পৌঁছায়নি । আমাকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন, “আমি ৎসুয়োশি নারা । আপনি”? তাড়াতাড়ি নিজের হতচকিত ভাব সামলে নিজের পরিচয় দিলাম আর সেই সঙ্গে আসার কারণটাও জানালাম । কারণ শুনে ঘরে এসে বসতে বললেন । কিন্তু আমার তাড়া ছিল । দরজার সামনে দাঁড়িয়েই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে একটা ঘোরের মধ্যে বিদায় নিলাম । সেই প্রথম দেখা । আর আমি প্রথম পরিচয়ে মুগ্ধ । এত ভদ্র অমায়িক ব্যবহার আর কথাবার্তা ---তাও আবার বাংলাতে । মুগ্ধ না হয়ে উপায় কি !

সেই শুরু । এরপর কলকাতাতে থাকাকালীন বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে । আমাদের বিয়ের সাক্ষীও ছিলেন সেনসেই । বিয়ের পরে আমার জাপানে আসার কয়েক বছরের মধ্যে উনিও জাপানে ফিরে আসেন । এবার ওঁর উৎসাহে শুরু হোল জাপানী ভাষা শিক্ষা । আমি নিজে অবশ্য শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেরকম ভাবে শেখাটা এগোচ্ছিলনা । আমার অবস্থা দেখে এবার সেনসেই এসে হাল ধরলেন । আমার জাপানী ভাষার প্রথম শিক্ষক নারা সেনসেই । ওঁর উৎসাহ আর নিষ্ঠা দেখে অবাক হতাম আবার লজ্জাও পেতাম । সেইজন্য পড়াশুনাটা ঠিক মতন করতে হয়েছে, মানে বাধ্য হয়েছি ।

১৯৬৪ সালের কথা । তখন এতো বাংলা ভাষা বা বাংলা সংস্কৃতি চর্চার কোনরকম সুযোগই ছিলনা এখানে । আমার বাংলা চর্চা তখন রেডিও জাপানের ১৫ মিনিটের বাংলা প্রোগ্রামে । ভারতীয় দূতাবাসে বেশ কিছু বাঙালী ছিলেন সপরিবারে তখন । কিন্তু সংস্কৃতি চর্চা বলতে যা বোঝায় তা একেবারেই ছিলনা । আমি সেখানে যেতাম শুধু বাংলা বলার অভ্যাস রাখতে । বাংলা আমার মাতৃভাষা, তায় বাংলার ছাত্রী আমি । বাংলা ভাষা ভালোবাসি মনেপ্রাণে । বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হোত । মনে হোত যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে । মন খারাপ করে থাকতাম, কিন্তু কোনও উপায় বার করতে পারিনি । নারা সেনসেই ফিরে এসে আমার অভাববোধটা বুঝতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়ালেন । যখন যেখানে পেরেছেন নানাভাবে বাংলা নিয়ে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন । টোকিও ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের আজিয়া আফ্রিকা কেনকিউজোও-তে যখন প্রথম বাংলা ভাষা শেখানো শুরু হোল, তখন সেনসেই-এর সঙ্গে নানা কাজ করেছি । পড়ানোর জন্য বাংলা ভাষার বই তৈরি করা, লাইব্রেরির বই গোছানো আর তার লিস্ট তৈরি করা ইত্যাদি । তারপর বাংলা ক্লাশ শুরু হলে সেখানে পড়ানোর সুযোগও এলো । কি উৎসাহ আর উদ্দীপনায় যে সেসব দিন কেটেছে তা বলার না । অল্প দিনের জন্যে হলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে কাজ করতে পেরে কি আনন্দ যে পেয়েছি ! সেসব দিনের কথা আমৃত্যু আমার মনের মনিকোঠায় জমা থাকবে । তা সম্ভব হয়েছিল নারা সেনসেই ছিলেন বলে । সংসারের নানান চাপে পড়ে আর আগের মতো ওঁর সঙ্গে নিয়মিত কাজ করা হয়ে ওঠেনি । তবে যোগাযোগটা সব সময়ই ছিল । ওঁর কাছে সব সময় কত রকমভাবে যে অসংখ্য সাহায্য পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যাবেনা । প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সব সময়ই বন্ধুর মতন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । সে ঋণ যেমন শোধ করার নয়, তেমনই ভোলার নয় ।

সেনসেই-এর সঙ্গে শেষ দেখা ওঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে । অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু শয্যাশায়ী ছিলেন না । অসুস্থ শরীর নিয়ে তখনও কত কাজ করে চলেছেন । বই নিয়ে অনেক কথা হোল । তখন তো বুঝিনি সেটাই শেষ দেখা । প্রকৃতির নিয়মে একদিন সব পাট চুকিয়ে জীবনের এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে মানুষকে বিদায় নিতে হয় । এর ব্যতিক্রম নেই । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আত্মা অবিনশ্বর । তার মৃত্যু হয়না । সেই বিশ্বাস নিয়ে নারা সেনসেই-এর আত্মার শান্তি কামনা করছি ।

“তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা ।

তোমার সে হাসিটুকু, সে চেয়ে দেখার সুখ

সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া” ।।

বঙ্গ রমণীর ইতস্তত জাপান দর্শন

- শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত

প্রথমবার জাপানে এসেছিলাম ১৯৯১ সালে । মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুভব করেছিলাম জাপানের সুবিদিত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, সদ্যফোটা চেরিফুলের মতন, নীল জলে মাকড়সার জালের চেয়েও হাল্কা সাদা সবুজ পাখনা মেলে জলপরিদের মত ভেসে বেড়ানো সুমিদা নদীর ছোট ছোট মাছের মতন । পৃথিবীর আধুনিকতম শহর টোকিয়োর তাক লাগিয়ে দেওয়া স্থাপত্যের আড়ালে আবডালে, দৈনন্দিনের আওতায় ঘুরে ফিরে আসে এই সৌন্দর্যবোধ, কখনো বা চতুর্দিকে প্যাস্টেল রঙের নিখুঁত খেলায়, রাতের শহরের অলিতে গলিতে ঝুলন্ত বড় বড় লন্ঠনের রূপকথায়, আবার কখনো বা শারীরিক কোনো মুদ্রায়, হয়ত বা চপস্টিক দিয়ে ছোট টুকরো খাবার মুখে তোলার কোনো ভঙ্গিতে ।

অনুভব করেছিলাম একটি জীবনদর্শনের, যেটির শিকড় সম্ভবত খুবই গভীরে । সমাজের পরতে পরতে যেন জড়িয়ে আছে সেই বোধ, যার বাহ্যিক প্রকাশ নিয়মানুবর্তিতাকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে জীবনের অংশ করে নেওয়া, নির্লিপ্তির আবহে নিজেকে ঘিরে ফেলা । ভিনদেশী কারুর পক্ষে সেই বোধটিকে ছুঁতে পারা প্রায় অসম্ভব - তাকে যেতে হবে শান্ত, প্রসন্ন, সবুজে ঘেরা নানান মন্দিরে, ফুজি-সানের পাদদেশে, তাকিয়ে থাকতে হবে বহুদিন ধরে বোঝার অপেক্ষায় । একটি সংস্কৃতি তার সবচেয়ে জরুরি ঐশ্বর্যটি সম্ভবত কখনোই কারুর সামনে মেলে ধরে না, রেখে দেয় একান্ত নিভৃতে - তুমি তার সন্ধান পেলে পাবে, না পেলে পাবে না ।

২০১৩-য় আবার ফিরে আসা । এবার আরেকটু বেশি সময়ের জন্য, রীতিমত রেসিডেন্স কার্ড হাতে নিয়ে । ক্ষীণ আশা, এবার হয়তো আরেকটু ভিতরে ঢুকতে পারব, আশ্চর্য এই দেশটিকে আরেকটু বেশি ছুঁতে পারব । ক্ষীণ, কারণ ভাষাজ্ঞানহীন মানুষ আর কতদূরেই বা যেতে পারবে ? যা হোক, পঞ্চেন্দ্রিয়কে নির্ভর করে যাত্রা শুরু হল । আকুতাগাওয়ার শিনসুকের মতন আমিও দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে জানতে বইয়ের জগতে পাড়ি দিলাম - জাপানি গল্প উপন্যাস ইংরাজি, ফরাসি অনুবাদে যা কিছু পাওয়া যায় পড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম । আবিষ্কার করলাম আরেকটি সম্পূর্ণ অন্য জগৎ যেখানে সেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ মিশে গেছে একটি গাঢ় অন্ধকারময় অতলের ইঙ্গিতে । তীব্র তার আকর্ষণ । লেখার ধরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । আমি অবশ্য সমসাময়িক কোনো লেখকের কথা বলছি না কারণ বিশ্বায়নের যুগে হয়ত বা সবচেয়ে অনূদিত আধুনিক লেখককে কোনো বিশেষ দেশের লেখক রূপে ঠিক তেমন করে আর চেনা নাও যেতে পারে । আক্ষেপ হল, এই বিশ্বায়নের যুগেও ইংরেজিতে অনূদিত জাপানি সাহিত্যের খুব ছোট একটা অংশই আমার দেশে পৌঁছায় । অনলাইন আনিয়ে নেওয়া যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগে সাধারণ পাঠককে জানতে হবে তো ! সেই জানানোর দায় কে নেবে ?

বইয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে আবার সব এলোমেলো হয়ে যায় । এ দেশ তো আমার দেশও হতে পারত-- মানুষে মানুষে তো তেমন তফাত কখনোই থাকে না । ক্লাসে বসে আছে ইউকা-সান, ইউকি-সান, কানা-সান, শিহো-সান, কৌসাকু-সান, মিকাকো-সান, তোদো-সান, ইউতো-সান, রেইমি-সান -- ওরা তো হতে পারত কোয়েল, মহুয়া, দেবলীনা, রিয়া, পার্থ, দেবশ্রী, সুমিত, রাজা, দীপা । ওরা সকলে ঠিক করেছে নিজেদের মত করে বেঁচে থাকবে । চাকরি করবে, তবে তার আগে পৃথিবীকে দেখবে, জানবে । জাপানি ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই খুব প্রত্যক্ষভাবে স্বতন্ত্র এক একটি চেহারা রয়েছে । একজন খুব ছটফটে, সব কাজে এগিয়ে আসে, পৃথিবীটাকে সামান্য হলেও পাল্টানো যায় বলে মনে করে, আরেকজন আপন মনে থাকে, সাজগোজ করতে খুব ভালোবাসে । আবার আরেকটি মেয়ের ইদানীং কোনোকিছুই আর পছন্দ হচ্ছে না - নেহাতই যৌবনের ধর্ম । একটি ছেলের গান বাজনার, লাগামছাড়া জীবনের দিকে ঝোঁক, অন্যটি ঝাঁকড়া চুলে হাত চালিয়ে আগে সব কিছু বুঝে নেয় । আবার আর একজন পার্ট-টাইম চাকরি করে, গম্ভীর ভাব, কদিন আগে খুব গেম খেলত বললে বিরক্ত হয় । মেয়েদের মধ্যে একজন বেশ যাকে বলে কেতাদুরস্ত - তাকে সেদিন দেখি এস্কালেটরে সোজা-উল্টো হয়ে সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে নামছে । আরেকজন শান্তশিষ্ট, চিড়িয়াখানায় যেতে এখনও তার ভালো লাগে, ছোটবেলায় খরগোশের গায়ে হাত দেওয়ার স্মৃতি আজও তার কাছে স্পষ্ট । ঐ যে যাদবপুরের অর্ণব গান শোনে, বই পড়ে, অর্ক ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে এসে সাহিত্য পড়ছে, কোয়েল কী যেন করবে ভেবে পাচ্ছে না, দেবলীনা একটু আলাদা, চোখদুটো খুঁজছে অন্য কোনও দেশ । যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য থাকলেও একে অপরের থেকে তাদের এতটা আলাদা মনে হত না । বাইরে থেকে দেখা কী একেই বলে ? ওখানে ছাত্রছাত্রীদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঢেল সময়, রাজনীতি করার, আড্ডা দেওয়ার, প্রেম করার, কবিতা লেখার । এখানে সময় বড় কম-- তবে তার বদলে ছেলেমেয়েরা পাবে নিশ্চিন্ত জীবন, একটা চাকরি । ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় যেন একটা দ্বীপ, বাইরে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অথবা এতটাই আলাদা যে মানিয়ে নিতে অনেক সময় লেগে যাবে ।

রাস্তায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরি - চারিদিকে ফুল, বাড়ির সামনে, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে, সর্বত্র । নীচে বাড়িওয়ালার সব্জির দোকান— তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রোজই একটু গল্প হয়, ভাষা না জানলেও আমরা দিব্যি কথোপকথন চালিয়ে যাই-- যেমন হতে পারত ওদেশে । পাড়া থেকে একটু বেরলেই শহরের মাঝখানে পৌঁছে যাওয়া যায় । বিশাল সমস্ত দোকানপাট, তুমি যা চাও তাই পাবে । তবে তোমাকে জানতে হবে এই এত বস্তুর সমাহারে তুমি ঠিক কী চাও ? চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় - এত বস্তুও আছে পৃথিবীতে ! মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে আমায়..." । ক্লান্ত হয়ে কোনও এক কিস্‌সাতেনে ঢুকে পড়ি । মাসানোবু ফুকুওকার "ওয়ান স্ট্র রেভোলুশন" খুলে আবার পড়তে বসি । "কৃষিকাজের উদ্দেশ্য ফসল উৎপাদন নয়, মানুষকে শোধন করে, তাকে পূর্ণরূপ প্রদান করা ।" স্বাভাবিক কৃষিকাজের কথা বলে, পৃথিবীর মানুষকে যিনি আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, শিকোকুর পাহাড়ের গায়ে তাঁর ক্ষেত । এই জাপানের-ই মানুষ তিনি, যে জাপানে রয়েছে আজকের দিনের সেই ইলেক্ট্রনিক মক্কা । না, বেরিয়ে পড়া যাক আবার রাস্তায় । ■

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বাংলার নবজাগরণ ও শিক্ষাজগত

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

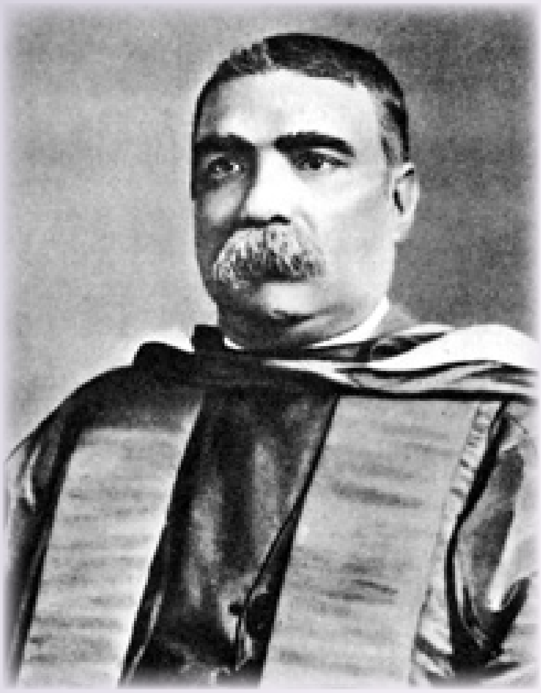

বাংলার নবজাগরণ ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্রম বিবর্তনের সূচনা

উনিশ শতকের শেষার্ধে যে সব বাঙ্গালী মনীষী বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল দুঃসাহসী এবং বহুমুখী অভিনবত্বে উজ্জ্বল। ১৮৬৪ সালের ২৯ শে জুন আশুতোষের জন্ম হয়, এই বছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার এবং ভারতের ইতিহাসে পরিবর্তন এসেছে প্রচুর এবং সেই পরিবর্তনের যে সব মঙ্গলজনক দিক তার বীজ বহু ক্ষেত্রেই উনিশ শতকের বাঙ্গালী মনীষীরা বপন করেছিলেন। আশুতোষের কর্মবহুল জীবন এবং তাঁর জীবদ্দশায় বাংলার সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয় তাতে তাঁর অবদান এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

উনিশ শতকের শুরুতে বাঙ্গালীর নতুন চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাপকতা ছিল আশ্চর্য্যজনক। তার পরিধি ছিল স্থবির সমাজের প্রায় সমস্ত দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য প্রতিকারকে জড়িয়ে। প্রায় সব বাঙ্গালী মনীষীই সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারে উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩০) ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মুক্তচিন্তার যে আলোক জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন তার মঙ্গলময়ী প্রভা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বাঙ্গালী যুবসমাজের যাত্রাপথের দিশারী হয়। কর্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাঁর বহুবিধ সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে, বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নবাগত বিদেশীদের মধ্যেও কেউ কেউ বাংলার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), যাজক উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-৭৮) এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারী আইন উপদেষ্টা জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের (১৮০১-৫১) নাম সুপরিচিত।

১৭৫৭'র পলাশীর যুদ্ধের পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব ভারতে রাজত্ব করতে শুরু করে এবং পরবর্তী ১০০ বছরে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার সরাসরি গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের রাজত্ব চালানোর জন্য যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন তারই প্রচলন করেছিল। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বা মানোন্নয়নের বিশেষ কোন চিন্তা তাদের ছিল না বলা যায়। তবে প্রয়োজনের খাতিরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিক থেকেই আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাজগতের অনান্য পরিবর্তন আলোচনা করার আগে আশুতোষের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

আশুতোষের উজ্জ্বল ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের সূচনা

আশুতোষের পরিবারের আদি বাসস্থান হুগলি জেলার জিরাট গ্রামে। কিন্তু আশুতোষের পিতা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, গঙ্গাপ্রসাদ প্রথমে উত্তর এবং পরে দক্ষিণ কলকাতায় বসবাস করতেন। আশুতোষের জন্ম কলকাতায় এবং তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন কলকাতাতেই। তাঁর মা জগত্তারিণী দেবী অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা মহিলা ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী উচ্চমধ্যবিত্ত গঙ্গাপ্রসাদ মেধাবী আশুতোষের প্রতিভার বিকাশে সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি এ পাশ করেন। তাঁর পরীক্ষার এই সাফল্য এতই অসামান্য ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী সমাবর্তনে উপাচার্য্য এইচ জি রেনল্ডস্ আশুতোষের কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ১৮৮০ সালে এফ এ ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ ইংল্যান্ডের Messenger of Mathematics জার্নালে "Extensions of a Theorem of Salmon" নামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন এবং বি এ পাশ করার বছরেই London Mathematical Society তাঁকে সভ্য হিসেবে মনোনীত করে। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে গণিতে এম এ পরীক্ষায় আশুতোষ আবারও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং সমাবর্তনে উপাচার্য্য সি পি ইলবার্ট আবার তাঁর উজ্জ্বল সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত তিনি আরও জানান যে আশুতোষ আইন পড়া শুরু করেছেন এবং সেখানেও মেধাভিত্তিক একটি স্বর্ণপদক ইতোমধ্যেই পেয়েছেন। আইনের ছাত্র আশুতোষ ১৮৮৬ সালে Natural Sciences, অর্থাৎ Physics এ এম এ এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (ইংরেজিতে এই বৃত্তি Premchand Roychand Scholarship বা PRS নামেই সমধিক পরিচিত) পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৮৮ সালে আইনের ডিগ্রী বি এল পাশ করে আশুতোষ কলকাতা হাই কোর্টে আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি আইনের ডক্টরেট ডিগ্রী Doctor in Law অর্জন করেন। ১৮৯৮ সালে টেগোর ল প্রোফেসর হিসেবে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন যেগুলি পরে The Law of Perpetuities in British India নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ সালে আশুতোষ কলকাতা হাই কোর্টের বিচারকের পদ গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য বহুবিধ দায়িত্ব সত্ত্বেও, ১৯২৩ সালে অবসর না নেওয়া পর্য্যন্ত এই পদে কাজ করেন। ১৯২০ তে কয়েক মাসের জন্য তিনি বাংলার প্রধান বিচারপতি হিসেবে কাজ করেন। বিচক্ষণ বিচারক হিসেবে আশুতোষ প্রায় ২০০০ মামলায় রায় দেন যার মধ্যে বেশ কিছু পরবর্তী সময়ে অন্য অনেক মামলায় কাজে

লাগে। আইনজীবী হিসেবেও আশুতোষের পসার ছিল ব্যাপক, কিন্তু তিনি অনেক অল্প বেতনে এবং অল্প বয়সে যে জজিয়তি করতে রাজী হন তার কারণ এই ব্যবস্থায় তাঁর পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব ছিল। হাইকোর্ট থেকে অবসর নেবার পরের বছর আশুতোষ উকিল হিসেবে একটি মামলার দায়িত্ব নিয়ে পাটনা যান। এই মামলায় তাঁর পারিশ্রমিক ঠিক হয়েছিল আড়াই লাখ টাকা! উকিল হিসেবে তাঁর খ্যাতি কতটা ছিল পারিশ্রমিকের এই পরিমাণটি তার সাক্ষ্য বহন করে।

পেশায় আইনজীবী হলেও গণিতশাস্ত্রের প্রতি আশুতোষের আকর্ষণ কখনও কমে নি। ১৮৮০ থেকে ১৮৯১ এর মধ্যে তিনি উচ্চতর গণিতে কুড়িটির মত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং আইনজীবিকার পাশাপাশি গণিতজ্ঞদের নানা সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে গণিতের বিভিন্ন শাখায় নিজের অবদানসম্বলিত বক্তৃতাদি দেন। এ ছাড়াও গণিতশাস্ত্রে আশুতোষের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় বহন করছে ১৮৯৩ এ প্রকাশিত An Elementary Treatise on the Geometry of Conics। ১৮৭৬ সালে, প্রধানত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে, বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার উচ্চতর কেন্দ্র হিসেবে কলকাতায় The Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ পর্য্যন্ত এখানে গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় নিময়িত পড়াতেন। মেধাবী ছাত্র ও প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হিসেবে আশুতোষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই।

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ভারতে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের আগে বিশেষ হয় নি বলা যায়। এই প্রসঙ্গে এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে যে পাঁচজন বিজ্ঞানীর অবদানে ভারতীয় গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় পরিচিতি পেতে শুরু করে তাঁদের মধ্যে আশুতোষ ছিলেন একজন (অন্য চার জনের নাম আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ডঃ প্রমথনাথ বসু)। 'বিজ্ঞানলক্ষীর প্রিয় পশ্চিমমন্দির' থেকে 'জয়মাল্যখানি' এনে 'দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে' পরানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় বন্ধু আচার্য্য জগদীশকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁর 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে।

আশুতোষের পান্ডিত্যের স্বীকৃতি দেশ বিদেশের নামী প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটি, আইরিশ রয়্যাল একাডেমি ও প্যারিসের সোসাইটি দ্য ফিজীক তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে। নবদ্বীপের সংস্কৃত পরিষদ থেকে তাঁকে 'কাব্যবাচস্পতি' ও 'সরস্বতী' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর মস্ত গোঁফের সঙ্গে এই শেষ উপাধিটির অসামঞ্জস্য তাঁকে এনে দেয় সুরসিক বাঙ্গালীর দেওয়া 'সগুম্ফ-সরস্বতী' উপাধি! মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় আশুতোষের নির্ভীক বজ্রকন্ঠ ছিল সদা-সোচ্চার। তাঁর দেশবাসী তাই তাঁকে বঙ্গ-শার্দুল বা বাংলার বাঘ বলেও সম্মান জানায়।

আশুতোষ নিজে ১৯০৮ সালে ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সম্রাট তাঁকে নাইট (স্যার) উপাধি দেন। Indian Science Congress এর প্রথম অধিবেশন হয় কলকাতায় ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষের সভাপতিত্বে। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্য আশুতোষের খ্যাতি প্রধানত দেশের শিক্ষাজগতে তাঁর বহুমুখী অবদানের জন্য। এই বিষয়টিতে যাবার আগে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম একশ' বছরের শিক্ষানীতির দু-একটি দিক দেখে নেওয়া যাক।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে কোম্পানীর উদ্যোগ

১৮১৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার পুনর্বহাল করার সময়, কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম চার দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে, ভারতে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং তাতে কোম্পানীর দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই চার্টার বার্ষিক এক লক্ষ টাকার বাজেটও ধার্য্য করে। ১৮১৭ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজের স্থাপনায় এই বাজেটের বরাদ্দ কাজে লেগেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী পদক্ষেপ আসে ১৮৩৫ সালে যখন ইংরেজি ভাষাকে ভারতের উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত শাসকের দিক থেকে হয়ত যুগোপযোগী ছিল কিন্তু এর প্রেরণা এসেছিল গভর্নরের আইন উপদেষ্টা লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলের সুচিন্তিত কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট অভিমত থেকে - যা Macaulay's Minutes নামে নথিভূক্ত হয়ে আছে বিদেশী শাসক ও শাসিত ভারতীয়দের অসম এবং অবজ্ঞাপূর্ণ সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে। মেকলের মতে ভারতীয়দের মাতৃভাষাগুলি ছিল 'language of slaves'। তিনি আরও একধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ইউরোপের ভাল কোনও পাঠাগারের একটি 'শেলফ' এ রাখা সাহিত্যকীর্তির গুণগত মান ভারত এবং আরব দেশের সম্পূর্ণ সাহিত্যভান্ডারের চেয়ে উচ্চতর। মেকলে অবশ্য প্রাচ্যবিদ্যাবত্তায় তাঁর নিজের পান্ডিত্যের অভাব তাঁর Minutes এ স্বীকার করেন। তবে তিনি যে তাঁর নিজের দেশে এবং ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁর অভিমত প্রকাশ করছেন এ কথাও বলেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল যে মেকলেরই একজন স্বনামধন্য দেশবাসী স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সালে কলকাতায় প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং এখানেই, ১৭৮৬ সালে, তিনি প্রথম তাঁর গবেষণালব্ধ অভিমত প্রচার করেন যে ক্লাসিকাল লাতিন এবং গ্রীক ভাষা খুব সম্ভব সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং অনেক দিক থেকে সংস্কৃত লাতিন ও গ্রীক ভাষার তুলনায় মার্জিততর।

সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন এবং অসংলগ্ন এইসব প্রস্তাবগুলি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে শাসকদের উদাসীনতারই পরিচয় বহন করে। শিক্ষার প্রসার ও মান সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে এই উপলব্ধি থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভ্য স্যার চার্লস উড ১৮৫৪ সালে লন্ডন থেকে কলকাতায় গভর্ণর লর্ড ডালহৌসির কাছে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত সুপারিশমালা পাঠান যেটা Wood's Despatch on Education নামে পরিচিত। এই সুপারিশগুলির ভিত্তিতেই পরবর্তী কয়েক দশক ধরে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি দানা বাঁধে যার প্রভাব শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে বলা যায়।

এই ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলির মধ্যে অন্তত দুটি এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথমটি হল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। এই দুটি বিষয়ের অগ্রগতিতেই আশুতোষের অবদান অসাধারণ। তাই সেই প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। ১৮৫৭ সালে প্রস্তাবিত এই তিনটি বিশ্বাবিদ্যালয় তিনটি শহরে স্থাপিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার প্রস্তাব ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বিশ শতকের প্রথম দশককে একটি ক্রান্তিকাল বলা যেতে পারে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী তাদের প্রতি শাসকশেণীর উদ্ধত এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারে যখন ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তখনই জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) ভাইসরয় হিসেবে কলকাতায় এলেন ১৮৯৮ সালে। শিক্ষিত ভারতীয়ের প্রতি কার্জনও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না কারণ অন্য অনেক ইংরেজের মত তিনিও মনে করতেন যে শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজ শাসনের সুফলগুলির প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ নয়। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ পর্য্যন্ত কার্জন বড়লাট হিসেবে ভারতে ছিলেন এবং ভালোমন্দ মিশিয়ে অনেক পরিবর্তন তিনি আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে যে দুটি পরিবর্তন-প্রস্তাব শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল তা

ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার প্রস্তাব এবং 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাব। এ দুটি প্রস্তাবই ১৯০৪ সালে আইনসভার অনুমোদন পেয়ে সরকারী সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বাঙ্গালী সমাজের চোখে দেখা দেয় ইংরেজের হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভেদবোধকে বাড়িয়ে নিজেদের কাজে লাগানোর অপচেষ্টা হিসেবে, আর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার প্রস্তাব দেখা দেয় উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী কর্তৃত্বকে সর্বগ্রাসী করে তোলার অভিসন্ধি হিসেবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ জড়িয়ে পড়েছিল বলা যায়, যদিও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে এই প্রতিবাদ তাদের আর্থিক এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রতি হিন্দু বাঙ্গালীর উদাসীনতার পরিচয় বহন করে এনেছিল। এই দিক থেকে দেখলে এই সময় থেকেই ব্রিটিশের 'divide-and-rule' নীতি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে শুরু করে এবং এর সমাপ্তি হয় ১৯৪৭ সালে 'divide-and-quit' এর বঙ্গ- এবং ভারত-ব্যবচ্ছেদে।

শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ শাসকশ্রেণীর বিরাগ ও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্ত বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে এবং কী ভাবে হবে তা নিয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তা বা পরিকল্পনা সেই মুহূর্তে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'ইউনিভার্সিটি বিল' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছিলেন "বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে – নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা"। পরে একটি জনসভায় তিনি আরও একধাপ এগিয়ে এইমত ব্যক্ত করেন যে "আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে"। এই প্রতিবাদী চিন্তার অঙ্গ হিসেবে এসে পড়ে বিদেশী-শিক্ষা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা। ইংরেজি-মাধ্যম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' বলে অভিহিত করা চালু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সেরা ছাত্র ১৯০৫ সালের শেষের দিকে আসন্ন এম এ এবং পি আর এস পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানান। পরে অবশ্য নেতাদের পরামর্শে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হয় নি, যদিও কলকাতা এবং মফস্বলের স্কুল-কলেজের প্রায় ৫০,০০০ মত ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে বিদেশী-শিক্ষা বর্জনের প্রতীকি প্রতিবাদে। যে সব গঠনমূলক ধারণা এই আন্দোলন থেকে আসে তার মধ্যে ছিল মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, ইংরেজিভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা এবং একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠন করা। এই ঘটনাগুলি বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্ত নয় বলে এদের বিশদে আর না গিয়ে আশুতোষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়া যাক।

শিক্ষাসংস্কারের মহাযজ্ঞে আশুতোষের নির্ভীক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

আশুতোষ দেশব্যাপী এই প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে স্কুল-কলেজ বর্জনের সিদ্ধান্তকে আশুতোষ 'জাতীয়-সর্বনাশ' বলে অভিহিত করে বলেছিলেন যে তাঁর নিজের উদ্দ্যেশ্য হবে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে ভৃত্যসুলভ মনোভাব এবং একগুঁয়েমি এই দুটি প্রবণতা থেকে সরিয়ে আনা। দেশের এই প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যেই শিক্ষাসংস্কার বিল বঙ্গীয় আইনসভায় আলোচনার জন্য আসে এবং আশুতোষ এই সভার সভ্য হিসেবে দিনের পর দিন এই বিলের সমালোচনায় অংশ নিয়ে এর গঠনমূলক দিকগুলির সংরক্ষণ এবং নেতিবাচক দিকগুলির পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। আইনসভার এই বিতর্কগুলি আশুতোষের প্রখর বুদ্ধিমত্তা, গভীর স্বদেশপ্রেম, যুক্তিবাদী বাগ্মীতা এবং শক্তিশালী শাসকের থেকে কতটা ন্যয্য প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব তার সম্বন্ধে দুর্লভ বাস্তববাদিতার পরিচয় বহন করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের ছাত্রজীবনে যে সম্পর্ক শুরু হয়েছিল তা বিভিন্নভাবে আমৃত্যু বজায় ছিল। ১৮৮৯ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভ্য মনোনীত হন, এছাড়া তিনি বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন ম্যাথামেটিক্স এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। যখন ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসী বিশেষত বাঙ্গালীর কাছে গভীরভাবে নিন্দিত, ঠিক সেই সময়, ১৯০৬ সালে, ভাইসরয় লর্ড মিন্টো আশুতোষকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসেবে মনোনীত করেন। এই সিদ্ধান্তটি আশুতোষকে একই সঙ্গে একটি বিশাল সুযোগ এবং একটি গুরু দায়িত্বভার এনে দেয়। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি একটানা এই পদে থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারি পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন। মনে রাখা দরকার যে এই সময় উপাচার্য্যের পদ ছিল অবৈতনিক। ১৯২১ সালে আবারও আশুতোষ উপাচার্য্য পদে আসেন, কিন্তু সে কথায় পরে আসা যাবে।

উপাচার্য্য হিসেবে আশুতোষের অন্যতম প্রথম কাজ ছিল যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাবর্জনের ডাকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের এবং তাদের 'প্রশ্রয়দাতা' স্কুল-কলেজগুলিকে সরকারী শিক্ষার আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত থেকে বড়লাটকে বিরত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছিল এবং ১৮৯০ এর দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মত নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। উপাচার্য্য হিসেবে আশুতোষ উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রে মাতৃভাষাগুলি ব্যবহার দেশবাসীর 'ন্যায্য অধিকার' হিসেবে আদায় এবং প্রচলন করে যান। কিন্তু আশুতোষ বিজ্ঞানশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিভাষাকেই রাখেন যাতে 'পশ্চিমের আলো পশ্চিমের জানালা দিয়েই ছাত্রদের কাছে পৌঁছয়'। এখানে মজার ব্যাপার এই যে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিরোধী আশুতোষের হাত ধরেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দুটি মূল লক্ষ্য – মাতৃভাষার স্বীকৃতি এবং ইংরেজি শিক্ষা বজায় রাখা – পূর্ণতা পেল!

আশুতোষের আগে পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ ছিল কেবলমাত্র স্কুল-কলেজগুলির পরীক্ষাদি পরিচালনা করা। শিক্ষাদানের কোনও ভূমিকা তাদের ছিল না। ১৯০৪ এর ইউনিভার্সিটি আইনের সুযোগ নিয়েই আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে কলাশাখায় গণিত, দর্শনশাস্ত্র এবং অর্থনীতি সহ নয়টি বিষয়ে পড়ানো ও গবেষণার ব্যবস্থা হয়। ১৯০৯ সালে আইন কলেজের জন্ম হয়। এই সব বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় কয়েকটি প্রোফেসর (চেয়ার) নিয়োগ করারও ব্যবস্থা হয় সরকারী অনুদানে। তবে ভারতীয় ভাষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে পড়ানো শুরু হতে আরও এক দশক সময় লেগেছিল।

বিজ্ঞানশাখায় উচ্চতর শিক্ষাদান অবশ্যই ছিল আরও ব্যয়সাপেক্ষ। ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ায় সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ অনেকটা ক্ষীণ হয়ে যায়। এ ছাড়া সরকারবিরোধী আন্দোলনে বাংলার নেতৃত্ব শাসক ইংরেজকে করে দেয় বাংলা-বিদ্বেষী। তাই অতিরিক্ত সরকারী আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আশুতোষ ছিলেন না। তাই বিজ্ঞানশাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের সংকল্প তিনি ত্যাগ করেননি। দেশের অবস্থাপন্ন শিক্ষানুরাগী বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত মানুষের কাছে তিনি উচ্চশিক্ষার নামে সাহায্যের আবেদন রাখলেন এবং অনেকটা অভাবনীয়ভাবেই সাহায্য এল একাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছ থেকে। প্রথিতযশা আইনজ্ঞ তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী

ঘোষ দুজনেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য আশুতোষের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে তাঁরা এগিয়ে আসেন। ১৯১২ সালে তারকনাথ দু-দফায় ১৪ লক্ষ টাকারও বেশী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে কাজে লাগানোর জন্য।

কথায় বলে 'জহুরী রতন চেনে'। জহুরী আশুতোষের উদ্যোগে এই অর্থে রসায়ন শাস্ত্রে এবং পদার্থবিদ্যায় পালিতের নামে দুটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয় যার প্রথমটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং দ্বিতীয়টিতে সি ভি রমণের মত দুই রত্নকে দেওয়া হয়। রমণের পর এই পদে এসেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের আর এক দিকপাল, ডক্টর মেঘনাদ সাহা। এঁদের সবাইকে নিয়ে আসেন আশুতোষ, যদিও যখন তাঁরা তাঁদের পদে যোগ দেন তখন আশুতোষ আর উপাচার্য্য নন। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিরলস কাজ করে যেতেন সম্ভবত শিক্ষার প্রসার এবং মানোন্নয়নের প্রতি আন্তরিক কর্তব্যবোধ থেকে, শুধু উচ্চপদের দায়িত্ববোধ থেকে নয়। বাংলার গভর্ণর লিটন আশুতোষের এই আগ্রহ লক্ষ করে মন্তব্য করেছিলেন "Asutosh .... represented the University so completely that, for many years, Asutosh was in fact the University and the University Asutosh"।

রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৪ সালে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা দেন যার থেকে ঘোষ-অধ্যাপক নামে আরও চারটি চেয়ার সৃষ্ট হয় ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদবিদ্যায় যেগুলি পান গণেশ প্রসাদ, ডি এম বসু, পি সি মিত্র এবং এস পি আগারকার। ১৯১৪'র মার্চ মাসে আপার সারকুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই বিজ্ঞান কলেজ ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পি সি রায়, সি ভি রমন ছাড়াও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, নিখিলরঞ্জন সেন, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক-গবেষকরা। এঁরাও সবাই বিজ্ঞান কলেজে এসেছিলেন আশুতোষেরই উদ্যোগে। বিজ্ঞান চর্চার এই অসাধারণ সুযোগগুলি অতি অল্পসময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সরকারী অনুদান ছাড়াই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখাও কিন্তু অবহেলিত ছিল না। ১৯২০-২১ সালে খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ প্রায় ছ'লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন যার থেকে ফাইন আর্টস, ভাষাতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে পাঁচটি চেয়ার সৃষ্ট হয়। কলাশাখার বিভিন্ন বিভাগে যে সব পন্ডিত অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেন, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ, ইতিহাসবিদ এইচ সি রায়চৌধুরী এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ আশুতোষের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন "genius anticipates experience will deliver"। আশুতোষ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত শিক্ষক-গবেষকের মধ্যেও যে প্রতিভার আভাস খুঁজে পেতেন তার অন্যতম উদাহরণ রাধাকৃষ্ণণ নিজে। আশুতোষ তাঁকে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ লেকচারারের পদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন পন্ডিত-প্রবর আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জায়গায়! রাধাকৃষ্ণণ পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, ভারতের প্রথম রাষ্টপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক সময় কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। একবার জজ আশুতোষের এজলাসে তাঁর কেস পড়ে। কেসটা শেষ হবার দু-একদিন পরে আশুতোষ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে পার্ট-টাইম পড়াবার প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সবিস্ময় সম্মতিক্রমে তাঁকে নিয়োগ করেন।

বহুভাষাবিদ ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম জীবনে সংস্কৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং আইনে ডিগ্রী করে বসিরহাট কোর্টে পসারহীন উকিল হিসেবে কাজ করছিলেন। এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি আশুতোষের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ চান। আশুতোষ তাঁকে ওকালতি ছেড়ে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে গবেষণা-সহায়ক হিসেবে কাজ করার পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় নিয়োগ দেন। শহীদুল্লাহ্‌সাহেব পরে প্যারিসের সোরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং গবেষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। অবিভক্ত বাংলার আর একজন কৃতী সন্তান (পরে শেরে-এ-বাংলা) ফজলুল হকসাহেব ছিলেন গণিতের মেধাবী ছাত্র। আইনে ডিগ্রী করার পর তিনি আশুতোষের জুনিয়র হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং পরে বিশেষ পসার অর্জন করেন। আশুতোষের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সারাজীবন এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে ১৯৫৩ সালে আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে তিনি ঢাকা থেকে শ্যামাপ্রসাদের বড় ভাই রমাপ্রসাদকে লিখেছিলেন 'পৃথিবীতে আমার একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যু আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে। বিশ্বাস কর, আমার এ বেদনা তোমাদের চেয়েও কম হৃদয়বিদারক নয়'।

উপাচার্য্য হিসেবে আশুতোষের দ্বিতীয় পর্ব এবং তাঁর জীবনের শেষ পর্ব

১৯১৪ সালের পর উপাচার্য্য না থাকলেও আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এবং নানাবিধ সংস্কারে নিয়মিত সময় দিতেন। ইংরেজ শিক্ষাবিদ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত একটি কমিশন (১৯১৭-১৯) অনেকগুলি সুচিন্তিত এবং ভবিষ্যতমুখী সুপারিশ বিবেচনার জন্য সরকারকে দেয়। আশুতোষ এই কমিশনের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং সুপারিশগুলির প্রস্তুতিতে তাঁর অবদান ছিল প্রভূত কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত মতামত ও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে সরকারী আর্থিক অনুদান বাড়াতে সরকার উৎসাহী ছিল না। তা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে সরকারের আমন্ত্রণে আশুতোষ আবারও উপাচার্য্য হতে রাজী হন। কিন্তু সরকারের শিক্ষানীতির অনুদারতায় হতাশ হয়ে উপাচার্য্য হিসেবে ১৯২২ সালে তিনি একটি জ্বালাময়ী ভাষণে সেনেটের সদস্যদের বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনুগত সন্তান' হিসেবে, প্রয়োজনবোধে, তাঁরা যেন নির্দ্বিধায় সরকারী শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেন। বোধগম্য কারণেই সরকার এতে বিরক্ত হয়। তা সত্ত্বেও আশুতোষের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর পরিপুর্ণ আস্থা থেকে ভাইসরয় লিটন ১৯২৩ সালে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে আশুতোষের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। এর মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল সরকারী নীতির বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার আশ্বাস দেওয়া। স্বাধীনচেতা বঙ্গশার্দূল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জবাব দেন এই ভাষায় - 'It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your government and act as a spy on the senate. ..... He will certainly not enjoy the confidence of Bengal. .... I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, which you and your advisers expect and desire. I decline the insulting offer you have made to me.'

স্বল্পস্থায়ী এই দ্বিতীয় পর্বে আশুতোষ তাঁর দীর্ঘদিনের একটি প্রচেষ্টার সাফল্য দেখে যেতে পেরেছিলেন। এই দুই বছরে ভারতীয় মাতৃভাষার অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর এই সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি পেটাপেটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে মশায়ের। বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্য্যন্ত বিচলিত করেছিলেন"।

পরের বছর ১৯২৪ সালে উকিল আশুতোষ একটি মামলার ভার নিয়ে পাটনায় যান, কিন্তু মামলা শেষ হবার আগেই ২৫শে মে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার শিক্ষা এবং সমাজজীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ১৯১৭-১৯ এর শিক্ষা কমিশনের সহকর্মী হিসেবে আশুতোষকে কমিশনের নেতা সুপন্ডিত স্যাডলার খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুতে তিনি তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন, "In Asutosh Mookerjee India has lost one of her greatest men; the world one of its

commanding personalities. He was mighty in battle. He could have ruled an empire. But he gave the best of his powers to education because he believed that in education rightly lies the secret of human welfare and the key to every empire's moral strength".

মানুষ আশুতোষ

কথায় বলে 'দোষে-গুণে মানুষ'। আশুতোষের চরিত্রেও নানা বৈপরীত্য ছিল। কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি তাঁর সময়কার উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণের রক্ষণশীল মানসিকতার উর্দ্ধে ছিলেন না। যেমন তিনি সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে যান নি, এমন কি বড়লাটের বিশেষ উপরোধেও। আবার তিনি তাঁর বাল্য-বিধবা কন্যা কমলার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়েছিলেন রক্ষণশীল সমাজের হৃদয়হীন নানা কটূক্তি এবং আপত্তি সত্ত্বেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা হিসেবে তাঁর দুর্নাম ছিল স্বজনপোষক বলে। এ বিষয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন, এমন কি পুত্রদের, কারুর কারুর পরীক্ষার ফলাফল পাল্টানোর নানা গুজব শোনা যেত। বন্ধু রবীন্দ্রনাথের জামাই নগেন গাঙ্গুলীকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আশুতোষ নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন এ কথা সমসাময়িক অনেকেরই জানা ছিল। অবশ্য পরিবার-পোষণের একটা ধারা হয়ত বাঙ্গালী চরিত্রে আছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর নামও বাঙ্গালীর ব্যঙ্গে হয়েছিল 'বিশ্ব বা রথী'!!

উপসংহার

আশুতোষের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু জীবন অবশ্যই সাফল্যে ভরা। অবহেলিত মাতৃভাষাকে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন - এটা তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়ে অমরত্ব দিয়েছে বলা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের আবক্ষ একটি মূর্তি আছে তার নীচে ইংরেজিভাষায় এই ছোট্ট পংক্তিটি তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতি ঘোষণা করছে 'বিমাতার কক্ষে মাতার কণ্ঠস্বর' সসম্মানে শ্রবণে আনার জন্য।

"His noblest achievement, surest of them all,
A place for his mother tongue
In stepmother's hall."

মন্তব্য ও তথ্যসূত্রাদি

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-বলয়ের বাইরে, বিদেশে বসে বাংলা-কেন্দ্রিক বিষয়ের চর্চা পরভৃত হয়ে করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবুও দূরকে-নিকট-করা আন্তর্জালের (ইন্টারনেট) কল্যাণে অনেক মূল্যবান প্রকাশনা বা মন্তব্য ঘরে বসে দেখার সুযোগ হয়। কলকাতা এবং ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-বিষয়ক রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তারই কিছু-কিছুর ওপর এবং ইন্টারনেট-সূত্রে পাওয়া প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। যে সব বিশেষজ্ঞের লেখা বিশেষ কাজে লেগেছে তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হল। সন-তারিখের হিসেব দেওয়া সম্ভব হল না তার প্রধান কারণ দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত পত্র-পত্রিকার প্রিন্ট-আউটের সবগুলোতে সন-তারিখ নেই। কোথাও কোথাও কোন লেখকের নামও নেই।

D.P. Sengupta, 'Sir Ashutosh Mookerjee - Educationist, leader and institution-builder', Current Sciences, vol. 78, No. 12, 25 June, 2000.

Sir Asutosh Mookerjee: Mathematician, Jurist and Educationist. (http:www.vigyanprasar.gov.in/radioserials/asutosh mookerjee pdf) Downloaded 30 July 2014

University of Calcutta, about the University (http://caluniv.ac.in/about/defining-Events.html) Downloaded 2 August 2014.

Sonku Bilas Roy and Subir K. Sen, 'Scientific research papers by native Bengali authors during the nineteenth century', Current Science, vol, 99, No. 12 25 December 2010.

S. C. Ghosh, 'Calcutta University and Science', Indian Journal of History of Science, 29(1), 1994.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি।

আনিসুজ্জমান, 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ', আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ - বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪১৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০১-১৭।

সন্দীপ দাস, 'এক মহাজীবনের নাম শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়', দেশ, ৪ঠা জুলাই, ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭-২৯।

কুলদা রায় ও এম এম আর জালাল, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মিথ্যা মিথ', জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর, ২০১১।

[Srikanta Chatterjee is an Emeritus Professor of Economics at Massey University, New Zealand]

পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক দিন

- তপন কুমার রায়

হরিহরকে যেমন একদিন নিশ্চিন্দিপুর ছাড়তে হয়েছিল সাংসারিক ও সামাজিক কারণে, আমাকেও আমাদের যৌথ পরিবারের মধ্য কলকাতার বাসস্থান সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ-এর পাট এবার পাকাপাকিভাবে গোটাতে হোল । বাড়ীতে আমাদের ঘরে যা কিছু আসবাব ও অন্য জিনিসপত্র ছিল, সবকিছু গোছগাছ করে নিয়ে এলাম। কয়েকমাস আগে একদিন এই কাজটা করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল ।

ভারী আসবাবপত্র কন্ট্রাকটারের লোকজন ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর ঘন্টা কয়েক পরিশ্রমের পর প্রচুর ধুলো ঘেঁটে অনেক অনাবশ্যক কাগজপত্তর ফেলে দিয়েও কিছু ছবি, পুরোনো অ্যালবাম, কিছু স্মৃতি জড়ানো চিঠি ইত্যাদি কয়েকটা ব্যাগে ভরে নতুন বাসস্থানে নিয়ে এলাম ।

এর মধ্যে চোখে পড়লো একটা ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবারের (২৮শে মাঘ ১৩৮৫) আনন্দবাজার পত্রিকা । কাগজটার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের কিছু বেশী । কাগজটা একেবারে হলদে হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে । খুব সাবধানে একটা বড় খামে ভরে এবাড়ীতে নিয়ে এসেছি । কাগজটা যত্ন করে রাখার কারণ হোল ওর বনফুলের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে । ওনার লেক টাউনের বাড়ীতে ফুলে ঢাকা দেহর ছবি । খবর শেষ হোল পুষ্প প্রদর্শনীর খবর দিয়ে । আমার কন্যা তার সঙ্গীর সঙ্গে ফুলের মধ্যে দৌড়ে একদিক থেকে আরেক দিকে গেল । পরিচিত কয়েকজনকে ফোন করে ন'টার সময় ইংরেজী খবরটা দেখতে বললাম ।

কয়েকদিন হোল কাগজটা দেখতে দেখতে মনটা যেন পঁয়ত্রিশ বছর পিছিয়ে গেল । কাগজটা মাত্র ছ'পাতার । রবিবাসরীয়টা এর সঙ্গে ছিলনা । প্রথম পাতায় রাজনীতির খবর । কয়েকটা হেডিং বেশ ইন্টারেস্টিং । 'ইরানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কয়েক শ হতাহত'। রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সেনানীর লড়াই । প্রধানমন্ত্রী শাপুরকে গদি ছাড়তে আদেশ করেছেন বাজারগান । এর পর 'অটল চীন ঘুরে এলে কোসিগিন আসবেন', 'ভুট্টোকে বাঁচাতে ব্রেজনেভের আবেদন', 'বিহারে বিদ্যুৎ ধর্মঘট মোকাবিলায় সেনাবাহিনী', 'কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যু', 'সঞ্জয় গান্ধী রাজনীতি ছাড়েননি', 'ওড়িষ্যার পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও ছ'মাস পিছিয়ে গেল', 'নানা রাজ্যে আত্মকলহে কংগ্রেস-ই নেতৃত্ব বিচলিত', 'পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারে জনসমর্থন আছে কিন্তু কাজ তেমন হচ্ছেনা' ইত্যাদি । দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতা বিজ্ঞাপনে ভর্তি । কেবল দ্বিতীয় পাতার নিচে

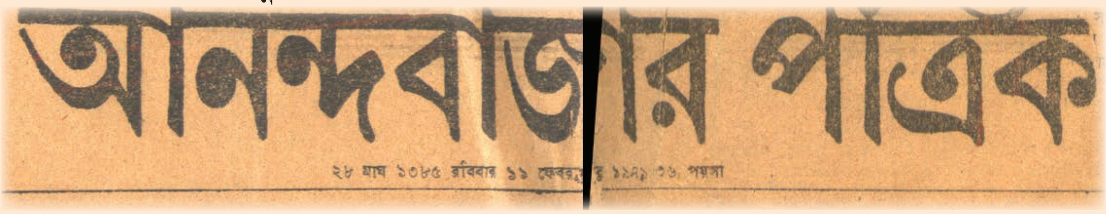

প্রথম পাতার একটি ছবি । দুটি শিশু একটা বাগানে বিরাট একটা ডালিয়া ফুলের পাশে খেলছে । ওই শিশু দুটির মধ্য একজন হোল আমার কন্যা । ওর তখন বয়স চার ছাড়িয়েছে । আগের শুক্রবার অর্থাৎ ন'তারিখে আমরা আলিপুরের হর্টিকালচারে ফুলের প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম । পৌঁছতেই কয়েকজন ফোটোগ্রাফার আমাদের অনুমতি নিয়ে আমার কন্যা এবং আরেকটি বাচ্চা মেয়ে যোগাড় করে ওদের নিয়ে রীতিমত ফোটো সেশন করে ফেললো । ওদের ছবি তোলা হলে আমরা ফুলের সমারোহ দেখে ফিরবো । সে সময় একজন ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আজ রাত্রে দূরদর্শনে খবর দেখবেন"। আরেকজন বললেন, " এই রোববার যদি ভুট্টোর ফাঁসি না হয়, আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় ছবি থাকবে । যতদূর মন পড়ে ওনার নাম দেবীপ্রসাদ সিংহ ।

তখন দূরদর্শন ছিল সাদা কালো । সন্ধ্যেবেলা সাতটা আর রাত ন'টার সময় ইংরেজী খবর হোত । ছন্দা সেন খবর শুরু করলেন

গোয়েন্দা রিপ ও অরণ্যদেব ।

চতুর্থ পাতায় সম্পাদকীয়, সম্পাদক সমীপেষু, সন্তোষ কুমার ঘোষের কলাম, প্রথম পাতার সংবাদের শেষাংশ, আর বিধানসভার কার্যবিবরণী । সম্পাদকীয়তে প্রথমটি শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ আর পরেরটায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটি টেস্টে হারিয়ে বাকী তিনটিতে ড্র করার জন্য সমালোচনা ।

সম্পাদক সমীপেষুতে জনৈক আবু তাহের, কলি-২৩ থেকে অভিযোগ করেছেন উর্দু ভাষী মুসলমানদের ছ'টি কাগজ আছে কলকাতায়, অথচ আনন্দবাজার বাঙালী মুসলমানদের জন্য কিছু লেখেনা কেন । একজন মহিলা রাস্তায় মহিলাদের জন্য প্রস্রাবাগার কম থাকার জন্য পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । মজার ব্যাপার হোল এই সব চিঠির সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ব্যঙ্গ চিত্র (সম্ভবত চন্ডী লাহিড়ির আঁকা) রয়েছে ।

এই পাতার একদম ডান দিকে বিধানসভার খবর । সেসময় বিরোধী নেতা ছিলেন কাশীকান্ত মৈত্র । মরিপঝাঁপি নিয়ে ওনার প্রশ্ন কেমন সুন্দর ডজ্ করে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বোস । অরাজকতার জন্য উত্তরে বলছেন 'কংগ্রেসী পুলিশ' ওনার কথা শোনেনা । জনসংঘের হরিপদ ভারতীও কম যেতেননা । সে সময় সি,পি,আই বিরোধী দলে ছিল ।

আনন্দবাজার গোষ্ঠী আয়োজন করেছিলেন কলকাতার প্রথম বইমেলা। বাংলা ভাষার মুদ্রণের দু'শ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ময়দানে বিশাল আয়োজন । কলেজ স্ট্রিটের প্রায় সমস্ত প্রকাশনা সংস্থা এই উপলক্ষ্যে ময়দানে তাঁবু গেড়ে ছিলেন । প্রথম পাতার নিচে ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বইমেলার ঘোষণা । পঞ্চম পাতায়

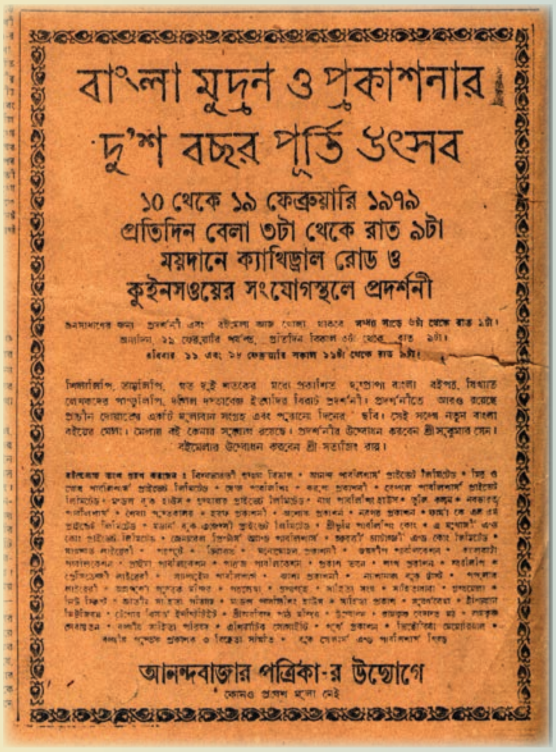

বিজ্ঞাপণ ছাড়া প্রথম পাতার খবরের শেষাংশ আর নিচের দিকে সামান্য খেলার খবর ।

শেষ পাতা অর্থাৎ ছ'য়ের পাতা খেলার খবর । 'কানপুরেই কি গাভাস্কারের শেষ টেস্ট'? কিরমানী, চন্দ্রশেখর, বিশ্বনাথ ও গাভাস্কার বোর্ডের অনুমতি চেয়েছেন প্যাকার সিরিজে খেলার জন্য । পাকিস্তান বোর্ডের মত ভারতীয় খেলোয়াড়দের ছাড়ার আবেদন করেছেন । বছরে আড়াই লাখ টাকা আর তার সঙ্গে সস্ত্রীক যাতায়াতের খরচ প্যাকার দেবেন বলেছেন । এছাড়া ডেভিস কাপে গো হারান হারার খবর আছে ।

এর পর আসি বিজ্ঞাপণের কথায় । সরকারি সংস্থা যেমন বিদ্যুৎ পর্ষদ, হাউসিং বোর্ড, ইস্টার্ণ কোলফিল্ড, এন টি সি এবং ও এন জি সি বাদ দিলে বেশিরভাগই বেসকারী । এক্সাইড, গেস্ট-কিন্স-উইলিয়ামস্, লারসেন টুব্রো, খৈতান ফ্যান, অলউইন রেফ্রিজারেটর, গোদরেজ আলমারী, অ্যাসপ্রো, নাম্বার টেন সিগারেট বাদ দিলে প্রচুর বাঙালী ব্যবসার বিজ্ঞাপণ । পিসি চন্দ্র, প্রিয়গোপাল বিষয়ী, ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন, তারামার্কা পাটবীজ, আরও অনেক যেগুলো ব্যক্তিগত কলামে আছে । সমস্ত ছাপা ব্লক দিয়ে সাদা কালো ।

এছাড়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপণ দ্বিতীয় পাতায় নিচের দিকে । বিশ্বরূপায় সাহেব বিবি গোলাম, পরিচালনা: রাসবিহারী সরকার, পটেশ্বরী সুপ্রিয়া দেবী । যোগেশ মাইমের সরীসৃপ । মুদ্রারাক্ষস, অভিনয়ে শম্ভু মিত্র । মহেন্দ্র গুপ্তের তত্ত্বাবধানে স্টারে কৃষ্ণকান্তের উইল, নেতাজী মঞ্চে জ্ঞানেশ মুখার্জীর কলরব, বয়েজ হল: ঘটকালী, রঙমহলে রবি ঘোষের পরিচালনায় ছদ্মবেশী, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের তেলেঙ্গানা, কমল মিত্র, তরুণ কুমার পার্ট করছে রঙ্গনায় দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ । তপন থিয়েটারে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নহবৎ । তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ পার্ট করছেন রামমোহন মঞ্চে থানা থেকে আসছি। অ্যাকাডেমীতে চেতনা গোষ্ঠীর মারীচ সংবাদ । সারকারীনায় সম্রাট ও সুন্দরী, নাটক নির্দ্দেশনা সমর মুখার্জী । এর সঙ্গে রবিবাসরীয় পেলামনা । আফশোস রয়ে গেল ।

বিজ্ঞাপণগুলো দেখলে সেই সময়কার কলকাতার সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায় । সমাজটা তখনো এত ক্রেতা সমাজ হয়ে ওঠেনি । সাধারণ কিছু সাবান, তেল, সুগন্ধী ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী প্রায় নেই বললেই চলে । টিভি চালু হলেও টিভির বিজ্ঞাপণ একটাও দেখলাম না । তখনও কলকাতায় বহুতল বাড়ীর রমরমা হয়নি । ব্যক্তিগত কলামে বাড়ী-জমি বিক্রির কিছু বিজ্ঞাপণ থাকলেও ফ্ল্যাট বাড়ী প্রায় সবই ভাড়ার জন্য ।

বাড়ীর সবাই মিলে পাঁচ সিকে বা সোয়া দু' টাকার টিকিট কেটে হাতিবাগান বা ভবানীপুরের কোনও থিয়েটার বা সিনেমা হল-এ নিপাট বাংলা বই দেখে ফিরতো । এক টাকা পঁচিশ পয়সাকে সাধারণ বাঙালী তখনও পাঁচ সিকে বলা ছাড়েনি ।

সে সময় খবরের কাগজ ছাপা হোত হাত দিয়ে টাইপ সেটিংএ । প্রুফ টেনে রাত দুটোর পরে ছাপার জন্য মেশিনে যেত । অবাক লাগে সারা কাগজে একটাও বানান কিম্বা অন্য ভুল চোখে পড়লো না । সেই কালি ঝুলি মাখা লুঙ্গি পরা রোগা রোগা মানুষগুলো কি করে এ অসাধ্য সাধন করতো ভাবলে অবাক লাগে । দেখলাম তখন কাগজটার দাম দিয়েছিলাম ছত্রিশ পয়সা । আজকের মুদ্রায় এই দাম আর গোনাও যাবেনা ।

একটা পুরোনো কাগজে কন্যার ছবি থাকার জন্য যত্ন করে রেখে দেওয়ার ফল হিসেবে "পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক দিন" ফিরে পেলাম । তাই হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ইচ্ছে হোল । অর্থনীতির পণ্ডিতরা কি বলতে পারবেন আজকের হিসেবে ওই ছত্রিশ পয়সার মূল্য কত ? ■

তুরুপের তাস

- অরুণ গুপ্ত

রামরতন পোদ্দার পাড়ার লোকের কাছে ম্যাজিশিয়ান বলেই পরিচিত । আসল পেশা চাকরি হলেও সেটা বলবার মত তেমন কিছু নয় । নিজে অকৃতদার বলে চাকরির টাকায় একা লোকের খরচা চালাতে কোনও বেগ পেতে হয়না ।

ইতিমধ্যে উনি পাড়ায় বেশ কয়েকটা ম্যাজিক শো করেছেন । বলাবাহুল্য, সেসব শোতে আশাতীত সাফল্য পেয়েছেন । যৌবন বয়সে জ্যাঠামশাই রবিরতনের কাছে ম্যাজিক শিখেছেন এবং সেগুলোই নিয়মিত চর্চা ক'রে আজকে নিজেকে ম্যাজিশিয়ান বলে পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন । রবিরতন মারা যাওয়ার আগে তার ভাইপোকে হাত সাফাইয়ের এমন একটা নতুন দিক উন্মোচন ক'রে দিয়েছিলেন যেটা তার মতে কোনও বড় ম্যাজিশিয়ানের পক্ষেও সম্ভব নয় । শেখানোর আগেই নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন "এই খেলা সব জায়গায় দেখাস না । এটা তোকে অন্য ম্যাজিশিয়ান থেকে স্বতন্ত্র রাখবে"।

প্রথম প্রথম পাড়া বা অফিসের কোনও ফাংশনে ম্যাজিক দেখিয়ে রামরতন কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না । কিন্তু ইদানিং নিতে বাধ্য হচ্ছেন । কারণ একটা 'শো' অরগানাইজ করতে খরচ কিছু কম হয় না । দর্শকদের নিরিখে রামরতনের ম্যাজিক যে শুধু ফল্ট ফ্রি তাই নয়, নান্দনিকতার দিক থেকেও প্রশংসার দাবি রাখে । এ যাবৎ রামরতন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ম্যাজিক দেখিয়েছেন । তার ইচ্ছে বাংলার বাইরেও অনুষ্ঠান করেন । কিন্তু কিভাবে সেটা রূপায়ণ করা যায়, তা জানেন না । অফিসের সহকর্মী ইন্দ্রনীলের দিল্লির কালীবাড়ির কর্মকর্তাদের সঙ্গে জানাশুনা আছে । সে-ই বললো, "দাদা, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় । আপনার ইচ্ছে আছে আর আমার কাছে এর উপায় আছে । এবার দুর্গোপুজোয় দিল্লির কালীবাড়িতে আপনার একটা 'শো'এর বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি । এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন"।

ইন্দ্রনীল যে ফালতু কথা বলার ছেলে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল কালীবাড়ির সেক্রেটারী কাছ থেকে রামরতনের নামে যখন নিমন্ত্রণ আসলো । চিঠিটা পেয়ে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না । তাই বার বার চিঠিটা পড়তে লাগলেন । সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ার থেকে নেমে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিলেন । কর্তৃপক্ষ দু' দিনের থাকা খাওয়া ছাড়া দু' পিঠের ট্রেন ভাড়া পর্যন্ত দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । কর্তৃপক্ষের এই বদান্যতায় রামরতন যার পর নাই খুশী ।

অষ্টমীর দিন সকালে রামরতন তার সহকারী পিন্টুকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছান । স্টেশন থেকে সটান দিল্লির কালীবাড়ি গিয়ে অফিসে নিজের পরিচয় দিতেই ওরা ওদের থাকার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেন । যাত্রার ধকল কাটিয়ে স্নান আহারাদি সেরে সামান্য বিশ্রামের পর রামরতন পিন্টুকে নিয়ে মক্ প্র্যাকটিস শুরু ক'রে দেন । দিল্লিতে যতগুলো খেলা দেখাবেন তার প্রত্যেকটি বার দুয়েক ক'রে সড়গড় ক'রে নেন । প্রত্যেক 'শো'এর আগে নিয়ম ক'রে উনি এটি ক'রে থাকেন । এবারও তার ব্যতিক্রম হোল না ।

সন্ধ্যে সাতটার সময় স্টেজে উঠে লক্ষ্য করলেন প্রচুর জনসমাগম হয়েছে । চিত্তরঞ্জন পার্ক বাঙালী অধ্যুষিত বলে রামরতন ইচ্ছে করেই খেলা দেখানোর সময় বাংলাতেই সব কথা বলেন । একেকটা খেলা শেষ হচ্ছে আর দর্শকদের করতালি কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে । ঘন্টা দেড়েক খেলা দেখানোর পর খেলা শেষ হলে যখন স্টেজ থেকে নামতে যাবেন, এমন সময় দর্শকের আসনে বসা প্রায় মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক অতি দ্রুত পায়ে স্টেজে এসে মাইক হাতে নিয়ে বললেন, "এইমাত্র আপনারা ওনার সৌজন্যে যা কিছু খেলা দেখলেন, তার সবক'টি খেলা আমি নির্ভুলভাবে দেখাতে পারি, অবশ্যই যদি অনুমতি মেলে" । ভদ্রলোকটির কথায় দর্শদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায় । দর্শকের আসন থেকে অনেকেই দাবী করতে থাকেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই, দেখতে চাই"। সেই দাবী এতটাই সোচ্চার হোল যে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বাধ্য করলো পুনরায় ম্যাজিক 'শো'এর অনুষ্ঠান করতে ।

ভদ্রলোক পিন্টুকে সহকারী ক'রে রামরতনের দেখানো প্রত্যেকটি ম্যাজিক নিপুণভাবে ক'রে দেখালেন । দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে সেই খেলাগুলো দেখলেন । রামরতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চায়না । খেলা শেষে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে ভদ্রলোকটি যখন স্টেজ থেকে নেমে যাচ্ছেন, তখন রামরতন স্টেজে উঠে তার উদ্দেশ্যে বললেন, "একটু দাঁড়ান প্লিজ । আপনি আমার সব খেলা খুব নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন অবশ্যই আপনার প্রাপ্য । কিন্তু এবার যে খেলাটি আমি দেখাবো তা যদি ক'রে দেখাতে পারেন, তবে আপনার কাছে হার মানতে আমি বাধ্য হব"। ভদ্রলোকটি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন । দর্শকদের মধ্যে টান্ টান্ উত্তেজনা । রামরতন তার ম্যাজিক-গুরু জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে শেখা হাত সাফাইয়ের সেই চমকপ্রদ খেলাটি দেখালেন ।

খেলা দেখে দর্শকদের চোখের পলক পড়েনা । তারা কয়েক মিনিটের জন্য ইংরেজীতে যাকে বলে মেজ্মরাইজড্ হয়ে গেলেন । এরপর শুধু করতালির আওয়াজ । ভদ্রলোকটি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রামরতনের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কি সেজদা, আমায় চিনতে পারনি তো ? আমার অনুমান সত্যি, এ খেলা তুমি ছাড়া আর কারোর পক্ষে দেখানো সম্ভব ছিল না । আমি জানি বাবা একমাত্র তোমাকেই হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন । এই খেলাটা বাবা এক দক্ষিণ ভারতীয় যাদুকরের কাছ থেকে শিখেছিলেন । আমি অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও বাবা এই খেলাটি আমাকে শেখাতে চান নি" । রামরতনের মুখে কোনও কথা নেই, উনি চুপ ক'রে সব শুনে যাচ্ছেন । ভদ্রলোকটি আবার বললেন, "দূর থেকেই আমি তোমায় চিনতে পেরেছিলাম । শুধু শেষের ম্যাজিকটা দেখার জন্য তোমার অন্যান্য খেলাগুলো দেখিয়ে তোমাকে প্রভোক করেছিলাম" ।

রামরতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না । হ্যাঁ, ঠিকই তো ! এ তো তারই জ্যাঠতুত ভাই অরূপরতন ! বহু বছর না দেখা হলে যা হয় । স্টেজে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন । দর্শকদের মধ্যে আনন্দের লহর বয়ে গেল । ■

কূল ছেড়ে এসে মাঝ দরিয়ায়, পিছনের পানে চাই...

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

মার্চ ২০১৪. ২০টা বছর কেটে গেল এই দেশে,এই জাপান দেশে । বিয়ের আগেও কয়েকবার এই দেশে আসা নাচের সূত্রে মমদির সাথে মানে Mamata Shankar Ballet Troupe'এর সদস্য হিসেবে । উত্তরে হোক্কাইডোর আবাসিরি থেকে দক্ষিণে ওকিনাওয়া. ছোট-বড় কত শহরের কত মঞ্চে অনুষ্ঠান ।

নিজের শহর,পরিচিত রাস্তাঘাট,আপনজন আর তার মাঝে অনায়াস বিচরণ । মনের সুখে দৌড়ে বেড়ানো সকাল থেকে রাত্তির অবধি । মমদির স্কুল "উদয়ন"এ বাচ্চাদের নাচ শেখানো, প্রায় ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে দিন কেটে যেতো কোথা দিয়ে টেরও পেতাম না । সঙ্গে কলেজ ছিল, ছিল বিদেশ এবং স্বদেশে শো -ওয়ার্কশপ, আন্টির (গুরু থাঙ্কমনি কুট্টি)কাছে নাচ শেখা ।

এ তো সেই সুমনের গানের মতো, - "এ শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু..." ।

ঠিক ২০বছর আগে আমার সেই প্রিয় পরিচিত জগত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছলাম এই দেশে ।

নতুন মানুষজন, নতুন ভাষা, নতুন সমাজ-সংস্কৃতি, রীতিনীতি ...সব নতুনের মধ্যে পরে দমআটকা অবস্থা । পদে পদে ধাক্কা, দ্বন্দ, বিধ্বস্ত...আমার নাচ আমাকে বাঁচিয়ে রাখে । আমার ভালবাসা, আমার প্যাশন আর অবশ্যই আমার প্রফেশন । মনে পড়ে, বাড়ির কাছে একটা বড় জায়গা, সেখানে তখন নতুন সব বাড়ি উঠছে । মাঝখানে একটা ছোট্ট পুকুরের মত আর তার ওপরে একটা ছোট স্টেজ । দুপুরবেলা পিঠে একটা ব্যাগ ফেলে হেঁটে বা সাইকেলে চলে যেতাম ওখানে । পিঠের ব্যাগে থাকত একটা ব্যাটারিভরা ক্যাসেটপ্লেয়ার আর কিছু ক্যাসেট । মনের সুখে প্র্যাকটিস্ করতাম । ২/৩ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে যেত, টেরও পেতাম না । ওটাই ছিল আমার ওই দিনগুলোতে বাঁচার আনন্দ ।

প্রথম অনুষ্ঠানের ডাক আসে ফুকুশিমা থেকে. মন প্রাণ উজাড় করে দিই সেদিন স্টেজে । অনুষ্ঠানের পর এক মহিলা গ্রীনরুমে দেখা করতে আসেন । "কোথাও নাচ শেখান ?" উত্তরে বলি আপাতত নিজেই প্র্যাকটিস করছি । কোথায় কিভাবে শূরু করবো জানিওনা । ভিসিটিং কার্ড আদানপ্রদান হয়। আমি পরদিন টয়োটা শহরে ফিরে আসি । তার ঠিক ২দিন পর Toyota International Association (TIA) থেকে ফোন পাই । "এখানে একটা নাচের ক্লাস খুলুন । আপনি এই শহরে আছেন আর আমরা কিছু জানিই না. ফুকুশিমার সেই মহিলার কথা বলেন TIAর প্রিন্সিপাল । আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়ি । মানে সেই ফুকুশিমার মহিলা নিজে থেকেই ফোন করেছেন TIA তে । সেই ১৯৯৭এর এপ্রিল থেকে শুরু হয় কাবুকি দেশের ছেলে মেয়েদের ভারতীয় নাচ শেখানো । নাম হয় "TIA ইন্ডিয়ান ডান্স সার্কেল" । আমার কেমন মনে হয় যার যার নিজের দেশের শিল্প-সংস্কৃতি কমবেশি হলেও জন্ম থেকেই তার রক্তে থাকে । না শিখলেও না চর্চা করলেও, তাইতো আমাদের ভারতীয়দের, ঢাকের বাজনা শুনলে আপনা আপনিই শরীরটা দুলে ওঠে তালেতালে বা সানাই শুনলে মনটা ভারী হয় । তাই সেই দেশের ছেলেমেয়েদের নাচ শেখানো আর একদম আলাদা পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের শেখানোর মধ্যে অনেক ফারাক থাকে । এটাই স্বাভাবিক, তবে ধৈর্য রাখতে হয় ।

আমার ক্লাস ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাস । তাতে নাচ তো ছিলই তাছাড়া আরও কিছু টুকিটাকি. যেমন দেখা হলে হাত জোড় করে নমস্কার বলা । ক্লাসে স্লিভলেস বা হাফ প্যান্ট না পরা. এখানে তো নাচে মোজা বা তাবি'র প্রচলন আছে. ভারতীয় নাচে তা চলবেনা, সে বাইরের তাপমাত্রা ৩ই হোক বা ৩০ ইত্যাদি ইত্যাদি । আর মাঝে মাঝে কিছু tips. যেমন সকালের সূর্যপ্রনাম । শীতে চায়ের মধ্যে আদা কুচি দিয়ে খাওয়া বা লম্বা চুলে হাতখোপা করার পদ্ধতি । এরকমই ছোটখাটো কিছু জিনিস যা আমি ছোটবেলা মা-দিদাকে দেখে শিখতাম। ছেলেমেয়েদের অসম্ভব ইচ্ছা আর অধ্যাবসায় আমাকে অবাক করে । আমি শেখানোর থেকে শিখি বেশি । একাগ্রতা, অনুশীলন, পারফেকশন...চলতে থাকে । ভারতনাট্যমে দেবদাসীর ইতিহাস থেকে নাট্যশাস্ত্র, ফোক, রাবীন্দ্রিক, নজরুলগীতির সঙ্গে সঙ্গে মডার্নও আসে । আমি এক ফাঁকে একটু জাপানি নাচ শিখি আমারই প্রয়োজনে, ইচ্ছে ভারত-জাপান মেলবন্ধন ।

প্রথম কবে মা-বাবুর হাত ধরে নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম তা মনে নেই । পরে মায়ের কাছে শুনেছি তখন আমার বয়স ছিল ৩ । নাচ মানে তো শুধু সেজেগুজে স্টেজে ওঠা নয় -শরীরের এক্সারসাইজও । ফিট থাকে শরীর । পায়ের পাতায় ব্যথা ছিল – এখন অনেক কম । বা পিঠের ব্যথা আর টের পাইনা কিম্বা শীতকালে সর্দিকাসি অবধারিত ছিল এক বছর ধরে আর নেই... একেকজন এসে বলে যায় ক্লাসের পরে । আস্তে আস্তে মেয়েগুলো সালোয়ার কামিজ, শাড়িতে কেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ।

১৯৯৯র ডিসেম্বরে কলকাতার উদয়উৎসবে অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ আসে । আমার নিজের দেশের সংস্কৃতিতো রইলই. জাপানের সৌন্দর্যকেও কলকাতায় পৌঁছে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারিনা. জাপানের ৪টা ঋতুকে নিয়ে তৈরী হয় অনুষ্ঠান ।

'The Essence Of Japan' জাপানের চার ঋতু 'হারু, নাৎসু ,আকি, ফুয়ু(বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরত, শীত)'র সঙ্গে যোগ করি tsuyu বা বর্ষা । শুরু হয় otsukimi দিয়ে । স্টেজে হালকা নীলরঙে স্পট দিয়ে পূর্নিমার গোল চাঁদ দেখানো হয় তার সামনে থাকে একগুচ্ছ কাশফুল আর সাদা দাংগো. শরতকালের otsukimi বোঝাতে একটা জাপানি মিউজিক বেছে নিই । মেয়েরা ঢোকে পরনে শাড়ী আর হাতে প্রদীপ নিয়ে । বসন্তে আর বর্ষায় কবিগুরুর গানে মেয়েরা নাচে কিমোনো পরে । হাতে থাকে জাপানি ছাতা। একদম শেষে হলের পেছন থেকে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা ইউকাতা পরে হাতে উচিওয়া (জাপানি হাতপাখা) নিয়ে বনওদোরি নাচতে নাচতে ঢোকে । দর্শকরা নিজের নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পরে হাততালি দিতে থাকে । দুটো দেশ কেমন মিলেমিশে এক হয়ে যায় । ভাষার দরকার হয়না, সঙ্গীতের এমনই জোর । ভাবি, জাপানে নাচ শেখাতে শুরু করে মনে মনে যে ছবি এঁকেছিলাম সেই "ভারত-জাপান মেলবন্ধন" বোধহয় একেই বলে ।

TIA থেকে বেড়িয়ে নিজস্ব স্কুল তৈরী হয় । "TIA ইন্ডিয়ান ডান্স সার্কেল" থেকে নাম পাল্টে হয় "ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্স ট্রুপ" । এরমধ্যে ভাষাটা আরও একটু রপ্ত হয় । একটা খবরের কাগজে ৫০পর্বে ১বছর ধরে একটা লেখা বার হয় আমার । তার দুবছর পর একটা বই ছাপা হয় । এরপর থেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে স্পীচ দেবার আমন্ত্রণ আসতে থাকে । বিভিন্ন বিষয় বলতে ভারতের নারী, কিম্বা ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভারতের ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি । কখনও সোজাসুজি আমন্ত্রণ, আবার কখনো টয়োটা ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন বা নাগোয়া ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন-এর মাধ্যমে আমন্ত্রণ আসতে থাকে । ভারতে জন্মেছি বলে ভারতের সবকিছুই জানি তাতো নয় । তাই একেকটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করি । অনেক না-জানাকে জানতে পারি. আনন্দ পাই ।

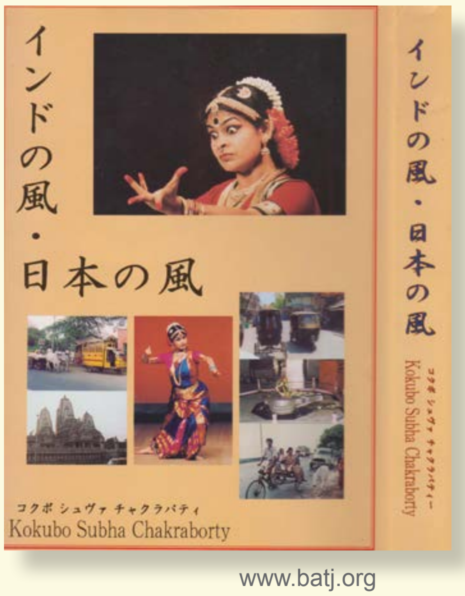

গতবছর ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ হঠাৎ নাগোয়া ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন থেকে এক চিঠি । খুলে পড়তে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়না । "সেকাই কাতারো মাইস্টার" অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে. আমাকে ? কেন? আমি কি এমন করলাম? জানানো হল সেইযে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে স্পীচ দিচ্ছি বা এপর্যন্ত দিয়েছি তার খবরাখবর এরা রাখে আর আমাকে বেস্ট লেকচারারের অ্যাওয়ার্ড "সেকাই কাতারো মাইস্টার" হিসেবে সিলেক্ট করেছে । আমাকে কি করতে হবে? জানানো হয় আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে, আর সেটা প্রায় ২৫০জন দর্শকের মাঝখানে । আমাকে দেড়ঘন্টা সময় দেওয়া হবে, তারমধ্যে লেকচারের একটা পার্ট থাকতে হবে । লেকচারের থিম আমি ঠিক করতে পারি. আর আমার প্রফেশন মানে নাচ নিয়েও কিছু করা যেতে পারে ।

委嘱状

小久保 シュヴァ 様

あなたを公益財団法人名古屋国際センター
「世界語ろマイスター」として委嘱します
委嘱期間は平成26年3月31日までとします

平成25年4月1日

公益財団法人名古屋国際センター理事長 花井 雅夫

যখন যেখানে স্পীচ দিয়েছি আর তারপর প্রশ্ন-উত্তরের সময় খেয়াল করেছি জাপানিরা ভারতীয় কাস্টসিস্টেম নিয়ে জানতে উদগ্রীব । তখন কম সময়ের

মধ্যে ছোটখাট উত্তর দিয়েছি বটে কিন্তু মনের কোথাও একটা খটকা ছিল । কেমন যেন অসমাপ্ত থেকে যেত. তাই আমি বেছে নিলাম ওই সাবজেক্টটাই । তবে শুধু ভারত নয়, এই কাস্টসিস্টেম বা মিবুনসেইদো পৃথিবীর সর্বত্র আছে, জাপানকেও তার থেকে আলাদা করা যায়না ।

বিভিন্ন বই ঘাঁটি, জানা হয় অনেক অজানা । টানা ৫০মিনিট ধরে চলে আমার স্পীচ । উপসংহারে বলি, আমি ভারতীয়, তুমি জাপানি, সে ইটালিয়ান কিম্বা তুমি জাতধর্মে বড়, আমি ছোট...সে বিচারের আগে আমরা মানুষ । বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ যেমন বলেছেন "যেই মানব আমি সেই মানব তুমি...". আমরা ইচ্ছে করলেই পারি পাশাপাশি হাত ধরে বন্ধু-পরিবারের মত চলতে । আজকে এখানে উপস্থিত এই ২৫০ জন থেকেই শুরু হোক সেই পথচলা ।

এরপর চন্ডালিকা পরিবেশন করি স্টেজে । অনুষ্ঠানের শেষে হলের বাইরে এসে দাঁড়াই দর্শকদের বিদায় জানাতে, আমি আর আমার গ্রুপের সদস্যরা । জলভরা চোখে শুভেচ্ছা

ভালবাসা জানিয়ে যান বেশিরভাগ দর্শক । নাগোয়া ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসে চিঠিতে, মেইলে, ফোনে - মনে শান্তি পাই ।

এখানে ইন্ডিয়ান রেস্টুরান্টগুলোতে নাচের অনুষ্ঠান হোতে দেখি মাঝেমধ্যে । চন্দন ধুপের গন্ধ আর চিকেন তন্দুরীর গন্ধ মিলেমিশে একাকার । জাপানিতে একটা কথা আছে kowai mono shirazu । বাংলায় এর অর্থ - না জানলে কোনো ভয় থাকেনা । দেবদাসীরা মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে নাচ দিয়ে যে পূজা করতেন সেই শাস্ত্রীয় নৃত্যের এমন দশা দেখে ডুকরে কান্না পায় । নিজের দেশের শিল্প-সংস্কৃতির মান নামতে দেখে চোখে জল আসে । পাবলিসিটির জায়গা কি ওটা ? আজ ২০বছরেও তো পারিনি । কিছু করার আগেই মমদির, আন্টির মুখগুলো মনে আসে । নিজের পিঠে আঁটা "ভারতীয়" তকমা বা আইডেন্টিটিকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে চলার চেষ্টা করে চলেছি সেই ২০বছর আগে থেকে, আজও । এভাবেই যেন ভারতের মান উঁচু করে পৌঁছে দিতে পারি দিকদিগন্তে । এগিয়ে যেতে পারি সামনে এই প্রার্থনাই জানাই সর্বশক্তিমান পরম ঈশ্বরের কাছে । ■

জল স্পর্শ করবো না আর চিতোর রানার পণ

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

রানা উদয় সিংহের পর মহারানা প্রতাপ রাজা হলেন । সেই সময় সমানেই মোগল সেনা আক্রমণ করে চলেছে । চিতোর ও মেবার দখলের জন্য আকবর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । এদিকে প্রতাপ তো কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করবে না, তাই বিখ্যাত হল্‌দিঘাটীর যুদ্ধ ১৫৭৫ সালে । সেখানে পাঁচ হাজার রাজপুত সেনা আর বাইশ হাজার মোগল সেনা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন । বিভিন্ন পাহাড় ও টিলার পেছন থেকে রাজপুতদের আক্রমণ কৌশলে আঠারো হাজার মোগল সেনা প্রাণ হারালো । শেষে আকবরের সেনাপতি মান সিংহ মহারানা প্রতাপের ঘোড়া চেতককে আক্রমণ করলেন ও চেতকের একটি পা ক্ষতবিক্ষত হোল । তবুও চেতক মহারানাকে নিয়ে সাত ক্রোশ পথ ছুটে একটি সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিল । তার পর একটি নদীর ধারে মাঝরাতে বিশ্বস্ত চেতক প্রাণ হারালো । চেতকের কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ।

চিতোরগড় থেকে রানা প্রতাপ রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসে উদয়পুরে নতুন রাজধানী করলেন । বার বার মোগল সেনার আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন নি । রাজপুত বীরদের মধ্যে রানা প্রতাপকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হয় যিনি ভারতবর্ষকে অন্য কোনও বহিরাগত শক্তির অধীনে যেতে দেবেন না এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকবে ---এই ছিল তাঁর পণ । তাই তিনি জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছেন ।

রানা প্রতাপ কি করে এই বিশাল অঞ্চলকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন তা এখন বিস্ময় মনে হয় । রানা প্রতাপের বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ, দেশের প্রতি মর্যাদা, সামরিক কুশলতা, সর্বোপরি মানসিক দৃঢ়তা ---এই সব কিছুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে উদয়পুরেই একটি এলাকায় টিলার উপর রানা প্রতাপের স্মারক তৈরী করা হয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে । এই স্থানটি দর্শন করতে হলে প্রবেশমূল্য দিয়ে নিয়মকানুন মেনে (চটি জুতো খুলে, কোনও রকম খাদ্যসামগ্রী বা নোংরা না ফেলা ইত্যাদি) যেতে হয় । টিলার ওপর থেকে এক দিকে উদয়পুর শহর ও অন্য দিকে 'লেক প্যালেস' (মহারাজা উদয় সিংহের নামে বিখ্যাত) দেখা যায় । সে এক মনোরম দৃশ্য ! মহারানা প্রতাপ চেতকের ওপর তলোয়ার হাতে –সেই মূর্তি, চেতকের অন্তিম শয্যার ফলক ইত্যাদি দেখে রীতিমত শিহরণ জাগে, রোমাঞ্চ লাগে এমনই স্থানমাহাত্ম্য। ঐ স্থানটিতে

ইতিহাস যেন প্রাণে সাড়া জাগায় । ঐ বিশাল এলাকাটির পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ জাপানের সঙ্গে তুলনীয় । তাই মনে হয়েছে হয়তো এটি সামরিক প্রথারই অঙ্গ । সামরিক মানসিকতা জাতিকে

দৃঢ়তা, আত্মসম্মানবোধ ও স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা দেয় । ঐ এলাকায় চারিদিকে ঢাল ও তলোয়ার দিয়ে সুন্দরভাবে পুরাতন ও নতুনকে একত্রভাবে সাজানো হয়েছে ।

এবার আসি 'সিটি প্যালেস' অর্থাৎ শহরের মাঝখানে বিশাল প্রাসাদের কথায় । এটিও এত বড় যে একে 'সিটি উইদিন অ্যা সিটি' বলা হয় । এই বিশাল এলাকায় গাইড ছাড়া ঢুকলে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে । প্রবেশপথ বেশ কয়েক ভাগে বিভক্ত । এগুলিকে বড়া পোল, ত্রি পোল ---এইভাবে নামকরণ করা হয়েছে । প্রাসাদটি চাক্ষুস দেখা এক অভিজ্ঞতা । সুরজ গোখড়া, মোর চক, দিলখুশ্ মহল, মোতি মহল, কৃষ্ণভিলাস, শম্ভু ভিলাস ---এই রকম অসংখ্য মহল দেখতে দেখতে রাজপুত কলা কুশলতার প্রশংসা না করে উপায় নেই । শত্রুকে আটকে দেওয়ার জন্য বা মেরে ফেলার জন্য সিঁড়ির মুখের ছাতটি এত নীচু যে অন্যমনস্ক হলেই মাথায় আঘাত বা প্রাণহানির সম্ভাবনা রয়েছে । বিভিন্ন ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করা যেন এক 'জিগস্ পাজল্' খেলা । কায়দা না জানলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক । কয়েকটি মহলে আয়না এমনভাবে লাগানো যে ধাঁধাঁয় পড়ে যেতে হয় । এই রকমই মহলে রানী পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখে আলাউদ্দিন খিলজী মুগ্ধ । সৌন্দর্য্যে পাগল হয়ে তিনি পদ্মিনীকে পাবার আশায় যে ছলে পড়েছিলেন, তা ইতিহাসে পাওয়া যায় । রাজপুত নারীরা নিজেদের কখনও বিদেশীর কাছে সমর্পণ করেনি । বিখ্যাত 'জওহর ব্রত' আমাদের সকলেরই জানা । এই সব দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, কোথায় যেন অতীত বর্তমানকে ছাপিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি সেই ঘোড়ার পদধ্বনি অথবা রাজপুত নারীদের সম্ভ্রমবোধ ও বীরত্ব ---

"পাঠান পতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা,
রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠান পতির চক্ষু হোল কানা ।।

উদয়পুর শহরে মহিলারা নিশ্চিন্তভাবে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে ---এটি দেখে খুব ভাল লাগলো ।

মহারানা প্রতাপের পর তাঁর ছেলে রানা সংগ্রাম যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর তাঁর রানী শকুন্তলা মনমরা হয়ে পড়তেন । তাই তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য রানীর সখীদের নামে রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দিলেন ---'সহেলিয়োঁ কি বাড়ী' । সেখানে রানী নিজের সখীদের নিয়ে আমোদ করতেন । অপূর্ব উদ্যান, নানা ধরণের ফোয়ারা সবই পুরাতন প্রযুক্তি বিদ্যায় তৈরি ---শাওন ভাঁদো, কমল কলইয়াঁ, বিন বাদল বর্‌সাত, রাসলীলা প্রভৃতি । অপূর্ব উদ্যানের মাঝেই দরবার বসতো । রানী ও সখীরা রানাকে নিজেদের আবেদন জানাতেন । তাই প্রাসাদ প্রাঙ্গনে রানী, তাঁর কন্যা ও সখীদের বসার জন্য বিশেষ সিংহাসন শ্বেতপাথরের তৈরি ও সাথে গোলাপের বাগান ।

পাহাড়, পাথর আর রুক্ষ জঙ্গল ---এই হোল মোটামুটি উদয়পুর থেকে মাউন্ট আবু পর্যন্ত একই চিত্র । কাঁটাগাছ, ঝোপঝাড় – তার সাথে দূর দূরান্ত পর্যন্ত শুষ্ক জমি । হঠাৎ কোথাও কোথাও জলের দেখা পাওয়া যায় । এই হোল রাজপুতানা । কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি । ১৫৬৮ থেকে এত বছরের পুরোনো কাহিনী যেন পাথরে পাথরে লেখা । এই মাটি ও রাজপুতানা সব কিছুর সাক্ষী । রাজপুত বীরদের কাহিনী ও সাথে সামরিক মানসিকতা উদয়পুর শহরের চারপাশে লক্ষণীয় ।

মেবার এক্সপ্রেসে করে এবার ফিরে আসার পালা । ট্রেনে বসে বার বার মনে পড়ছে আমরা কি আত্মবিস্মৃত জাতি ? আমাদের অতীত, ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাস, অগণিত বীর যোদ্ধা যাঁরা দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করেছেন; সেই ভারত যা ইতিহাস বইয়ের পাতায় আজ, কীভাবে একে আগামী প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় -- এই রকম নানা চিন্তার ঢেউ যখন মনে তোলপাড় করছে, তখনই মনে হোল আরেকবার ফিরে যাই সেই 'অমর চিত্রকথা'র গল্পে, 'কথা ও কাহিনী' বইয়ে বীর রাজপুত যুগে ।

"যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সেই পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা"। ■

ক্ষুদ্‌দা দেখে অবাক হয়ে যান

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দা ও রমলা বৌদি জাপানে অনেকবারই এসেছেন এবং প্রত্যেকবারই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং অবাক হয়ে দেশে ফিরেছেন । সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশে'র একটা গানের কয়েকটা লাইন বোধহয় ক্ষুদ্‌দার জন্য প্রযোজ্য ---

"আমি যেই দিকেতে চাই
দেখে অবাক বনে যাই
আমি অর্থ কোন খুঁজে নাহি পাইরে
ও ভাই রে, ভাই রে"।

২০১৪ সালে ক্ষুদ্‌দা ও রমলা বৌদি যখন জাপানে এসেছিলেন, তখন শীতের শেষ, জাপানে তখন সাকুরা ফুল ফোটার সময় । ২৭শে মার্চ টোকিওতে সাকুরা ফুল ফুটলো । অত্যন্ত সুন্দর দেখতে এই ফুল জাপানে আনন্দ, শান্তি এবং রোমান্সের যেন এক জীবন্ত সিম্বল । শুধু ফুল আর ফুল, গাছে কোনও পাতা নেই । সাকুরা ফুলের গাছের নিচে অনেকে পিক্‌নিক্ করে । কিন্তু আমাদের শিউলি বা রাধাচূড়া গাছের নিচে কাউকে পিক্‌নিক্ করতে দেখা গেছে কি ?

আমাদের কৃষ্ণচূড়া ফুলের সঙ্গে সাকুরা ফুলের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে যদিও এই ফুলের রঙ লাল । যেন বলতে চাইছে, "লোকেদের সংগ্রাম চলছে, চলবে"। ভালো স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করানোর সংগ্রাম, পাড়ার রোমিওদের নজর থেকে বাঁচিয়ে নিজের সুন্দরী কন্যার জন্য সুপাত্র খোঁজার সংগ্রাম, ভোটে জেতার সংগ্রাম, সি বি আই-এর হাত থেকে বাঁচার সংগ্রাম, বস্‌কে তেল দিয়ে ওপরে ওঠার সংগ্রাম এবং একই সঙ্গে সুন্দরী পি এ-কে নিয়ে ট্যুরে যাওয়ার সময় ওয়াইফদের আটকানোর সংগ্রাম – সবই করতে হয় । তবে শেষের সংগ্রামটি বৌদি শক্ত হাতে করতে পেরেছিলেন বলে গৃহে শান্তি রক্ষার জন্য শনি /সত্যনারায়নের পুজো করতে হয়নি বা কোনও 'বাবার থান'এ ঢিল বাঁধতেও হয়নি । জাপানের কিন্তু সংগ্রাম "চলেনি, চলছেও না," আর চলবেইবা কেন ? স্কুলে ভর্তি করানো কোনও সমস্যাই নয় । বিশেষ করে শেষের বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে জাপানের মহিলারা কেউ হাউসওয়াইফ নয়, তারা তাদের বসের সঙ্গে কোম্পানীর উন্নতির জন্য ট্যুরে যেতেই পারেন বা পাঁচ তারা হোটেলের নিভৃত কক্ষে কোম্পানীর সেলস্ প্রোমোশনের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতেই পারেন । মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং (স্বামী স্ত্রীর মধ্যে)---প্লাস মাইনাসে কাটাকুটি ---সংগ্রামের কী দরকার ?

কলকাতায় বা শহরতলীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মহাসমারোহে পালিত হয় । এই বৃক্ষরোপণ উৎসব বাঙালীর তেরো পার্বণের জায়গায় বর্তমানে সাড়ে তেরো পার্বণে পর্যবসিত হয়েছে । কারণ এতে রাজনৈতিক দলগুলির টিভি প্রচারের বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায় যেটা সুবিধামতন কাজে লাগানো হয় । দ্বিতীয় কারণ শান্তিনিকেতনের কায়দায় পাড়ায় পাড়ায় মহাসমারোহে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা যায় । এখানে সাধারণত পাড়ায় উঠতি কিশোরীরা খোঁপায় সাদা ফুলের মালা লাগিয়ে চারাগাছ রোপণের প্রধান কুশীলব হয়, যাদের সুরেলা কণ্ঠে থাকে রবীন্দ্রনাথের গান,

"মরু বিজয়ের কেতন উড়াও
উড়াও হে শূন্যে
ধূলিরে ধন্য কর"।

আর এই অনুষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকে কলেজ পড়ুয়া রবীন্দ্রভক্ত স্থানীয় রোমান্টিক কিশোরেরা । দাদা বৌদিও কি এই রাস্তা দিয়ে যাননি ? নিশ্চয়ই গেছেন । জাপানেও তো প্রচুর গাছ আছে । বৌদির প্রশ্ন, এখানে তাহলে বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়না কেন ? এখানকার টীন এজাররা এই রোমান্টিক অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হোল কেন ? এই নিয়ে এরা বিপ্লব করেনা কেন ?

গাছ তো লাগানো হোল, কিন্তু সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শতকরা ষাট ভাগ চারা গাছের মৃত্যু হয় ঠিক উঠতি ছেলেমেয়েদের তাৎক্ষণিক ভাবাবেগপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী রোমান্সের মত । কলকাতার ফুটপাথে বা খোলা মাঠে চারা গাছগুলোর মৃত্যু হয় গরু ছাগলের উদরে যাওয়ার জন্য এবং জল সিঞ্চনের অভাবের জন্য । কিন্তু জাপানের রাস্তায় গরু ছাগল কেউ দেখেছে বলে শোনা যায়নি । এখানে কি তাহলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর বলে কিছু নেই ? অবশ্য এখানে ছাগল থাকবেই বা কেন ? ভারতবর্ষে ছাগদুগ্ধ পানের প্রচলন গান্ধীর আমল থেকেই চলছে এবং মা কালীর সামনে পাঁঠা বলির রেওয়াজ আজও অব্যাহত । জাপানে ছাগল নিয়ে গান্ধীজী কখনও আসেননি এবং কালী মন্দির নেই বলে কচি নধর পাঁঠা ও তাদের পরিবারদেরও রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করতে দেখা যায়না ।

তবে ক্ষুদ্‌দা বা বৌদি বর্তমানে কোনরকম দুধ না খেলেও দাদার ধারণা বৌদির মস্তিষ্কের সিংহভাগ অংশে গরুর 'পটি'র অনধিকার প্রবেশ এবং তার উপস্থিতি পারিবারিক কলহের মূল সূত্রপাত, "মাথায় গোবরের সঙ্গে আরও কিছু থাকার কথা"।

কোলকাতায় গাছেদের জীবন/মৃত্যুর দায়িত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর

করে গরু, ছাগল এবং ভগবানের দয়ার ওপর । গাছেরা যদি 'ফুল গ্রোওন ট্রি' হয়ে উঠতে পারে, তাহলে প্রধানত তিনটি উপকার তারা করে ---স্থানীয় পরিবেশ শীতল করে, গাছের নিচে চায়ের দোকান বা শনি মন্দির বানাতে সাহায্য করে যেখানে জুয়ার ঠেক্ গজাতে ও অর্থনীতি চাঙ্গা করতে চেষ্টা করে, গাছের শাখা প্রশাখায় পাখিদের বাসস্থান বানানোর 'আইডিঅ্যাল্ অ্যামবিঅ্যানস' তৈরি করে । পাড়ার কাজের মাসীদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে পবন দেবতা তাঁর বিশ্বস্ত লেফটেনান্ট কালবৈশাখীকে পাঠান পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করার জন্য । ভূলুণ্ঠিত বৃক্ষের ডালপালা নিয়ে কাজের মাসীদের কাড়াকাড়ি করার চির পরিচিত দৃশ্যের আবির্ভাব । কিন্তু বাস্তুচ্যুত পক্ষীকুলের দুর্দশার করুণ কাহিনী বর্ণিতও হয়না, জানাও যায়না । ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা অ্যানিম্‌ল্ প্ল্যানেটও সুকৌশলে এড়িয়ে যায় । মানেকা গান্ধীর বিপ্লব কোথায় গেল ? জাপানে কিন্তু গাছগুলোকে গোড়া থেকেই শক্ত খুঁটির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় যাতে কোনরকম কালবৈশাখীতেও (জাপানে তাইফুন) গাছগুলো 'আপরুটেড' না হয় । বৌদির প্রশ্ন, তাহলে জাপানের কাজের মাসীরা যারা রান্নার গ্যাস এখনও নেয়নি তাদের রান্না হয় কি করে ? এখানে পাখিদের বাস্তুহারা হওয়ার কোনও আশঙ্কাই নেই কারণ দেশটির শহরাঞ্চলে পাখি প্রায় নেই বললেই চলে এবং যারা আছে তারা কেউ গাছে থাকেনা । অতএব কোনও আন্দোলন বা শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নই নেই ।

কলকাতায় পার্কে, ময়দানে বা বড় বড় বৃক্ষ দ্বারা সজ্জিত রাস্তা দিয়ে খুব ভোরবেলায় বা সন্ধ্যেবেলায় হাঁটলে পাখিদের মিলিত কণ্ঠে কিচিরমিচির আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যায়, অন্য সময় কিন্তু হয়না । বৌদি এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ক্ষুদ্‌দা বললেন, "তোমার শৈশবে বা কৈশোরে তোমার বাবা তোমাকে অনেক টাস্ক দিয়ে এবং তোমার মাকে হোম গার্ড হয়ে তোমার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে অফিসে যেতেন । তুমি পড়াশুনো না করে বিভিন্ন সিনেমা ম্যাগাজিনে নিমগ্ন থাকতে (তখনও টিভিতে বাংলা সিরিয়াল শুরু হয়নি) এবং তোমার মা তোমার দিকে নজর না দিয়ে পান জর্দার আমেজ সহযোগে দিবানিদ্রার সুখ থেকে বঞ্চিত হতে নারাজ । সন্ধ্যায় তোমার বাবা বাড়ী ফিরে এসে কথা না শোনার জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং রাগান্বিত হতেন । পাখিদের সংসারেও হয়তো এই রকম হয় । এছাড়াও কালবৈশাখীর ঝড়ে গাছ উৎপাটিত হলে সন্ধ্যায় ফিরে এসে যখন পাখিরা দেখে তারা বাস্তুহারা হয়ে গেছে, তখন তারা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করে । করাই স্বাভাবিক । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাদের নতুন বাসস্থান হয়েও যায় । তার জন্য তাদের কোনরকম সংগ্রাম, আন্দোলন, পথ অবরোধ, ট্রেন অবরোধ করতে হয়না ।

কিন্তু জাপানে এই ধরণের কোনও সমস্যাই নেই । শহরে পাখি কম তো কি হয়েছে, পাখিদের কিচির মিচির আওয়াজ ক্যাসেটে তোলা আছে, স্টেশনে গেলেই শোনা যায় । গাছ লাগাও কিন্তু ডাল ছেঁটে দাও যাতে পাখিরা বাসা বাঁধতে না পারে । বার্ড লাভাররা কিছু ভাবছেন কি ?

কলকাতায় ট্যাক্সি সমস্যা সর্বজনবিদিত । ট্যাক্সি ডাকলে ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমেই জানতে চাইবে কোথায় যেতে চান-- অর্থাৎ ড্রাইভারের পছন্দসই জায়গা না হলে যাবেনা । কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ক্ষুদ্‌দার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলে দাদা বলেন, "না না, আমি কোথায় যাব সেটা বড় কথা নয়, আপনার গাড়ী ঠিক কোথায় কোথায় যেতে পারে যদি বলেন তাহলে আমি চট্ করে ভেবে নেব সেদিকে আমার কোনও কাজ আছে কি না । ক্লান্ত ড্রাইভারের মুখে তাৎক্ষণিক হাসির ঝিলিক দেখা যায় ।

মিটারে সঠিক ভাড়া নেওয়ার পরিবর্তে বর্দ্ধিত ভাড়া নেওয়ার নতুন নতুন টেকনোলজির উদ্ভাবন কলকাতা জাপানকেও হার মানিয়ে দেয় । এ ছাড়া সওয়ারীকে দু/পাঁচ টাকা ফেরৎ দেওয়ার কোনও রীতি নেই । এটা নাকি স্বাধীন দেশের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের দীর্ঘ দিনের অর্জিত বৈপ্লবিক অধিকার । কিন্তু দিন কয়েক আগে জাপানে দাদার ছেলে তার বাড়ী থেকে ফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকেছিল এবং এক হাজার তিনশো ইয়েন দেওয়ার বদলে দশ হাজার তিনশো ইয়েন দিয়েছিল । পরে ট্যাক্সি কোম্পানী ন' হাজার ফেরৎ দিল যেটা দাদার কাছে একটা মেন্টাল শক্ ! এর পরেও কি জাপানের অর্থনীতি চাঙ্গা থাকবে ?

কলকাতায় ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে কোনদিনও একা একা ট্যাক্সিতে যেতে দেননা, রাত্তিরে তো নয়ই । জাপানে দাদা বৌদি একদিন তাদের এক আত্মীয়র বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং রাত প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত আড্ডা চলেছিল । রাত পৌনে তিনটের সময় দাদা বৌদি একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরলেন । এটাই জাপানের চলতি রীতি, অবাক হওয়ার কিছু নেই । কিন্তু বাড়ী ফিরে ক্ষিপ্ত বৌদি গোমড়া মুখে সিদ্ধান্ত নিলেন যে আর কক্ষনো দাদাকে জাপানে রাত্রে একা কোথাও পাঠাবেন না, কারণ ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল একজন সুন্দরী জাপানী মহিলা । ক্ষিপ্ত এবং শঙ্কিত বৌদির জন্যে হয়তো অতুলপ্রসাদ অভয়বাণী লিখে গেছেন,

"ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান ---"।

জাপানে সব কিছু দেখে ক্ষুদ্‌দা, বৌদি অবাক হওয়ার পরেও আবার হীরক রাজার দেশে ফিরে আসতে হচ্ছে ।

অবাক হওয়ার শেষ নাই,
বৃথা চেষ্টা কর তাই ।

ক্ষুদ্‌দা ভাবেন যদি পশ্চিম বাংলাকে কোনরকম ম্যাজিক দড়ি দিয়ে বাঁধা যেতে পারতো, তাহলে ক্ষুদ্‌দার স্লোগান এই রকম হোত ---

দড়ি ধরে মারো টান
বাংলা হবে জাপান সমান
বাঙালী জাপানীর ঐকতান
ইহাই মোদের গীতবিতান ।।

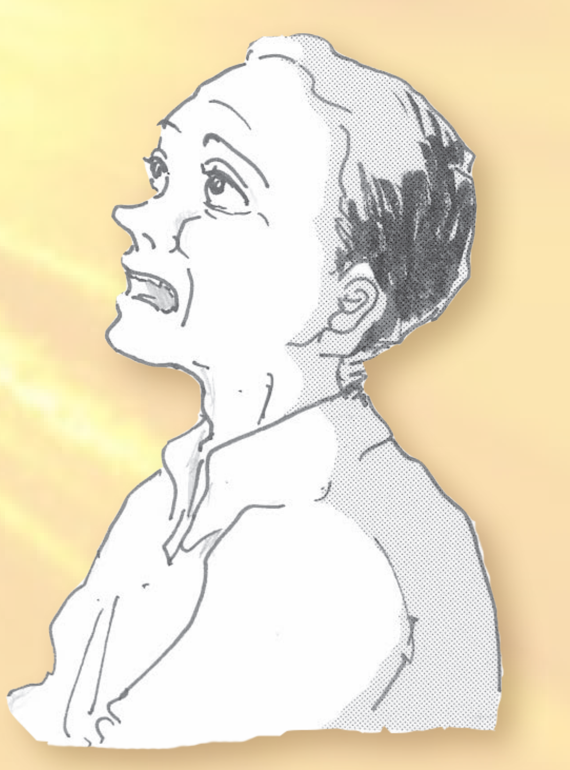

সিনাই-এর সূর্যোদয়

- গৌতম সরকার

এত সুন্দর এত মনোরম জায়গা আমি সত্যিই আর কোথাও দেখিনি। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। পাহাড়ের রং পাটকিলে, আর সমুদ্র অবশ্যই নীল। কিন্তু সূর্যের আলোয় সেই পাটকিলে আর নীল রঙের যে কত রকমফের আর বাহার হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। এত বালিও ছিল এ পৃথিবীতে? তারই মাঝে এদিক-ওদিক কিছু ক্যাকটাস জাতীয় গুল্ম; গজিয়ে আছে খাপছাড়া ভাবে। এখানে ওদের উপস্থিতিটা কেমন যেন অযাচিত অতিথির মতো। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। দেখে মন ভরে গেল। কিন্তু এখানে আসার আগে এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। যে জন্যে সিনাই-পেনিনসুলায় গেছিলাম, তা হোল একটা 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখা। আর তা দেখতে হলে সারা রাত trek করে উঠতে

হবে মাউন্ট সিনাই বা মাউন্ট মোসেস-এর ওপর, যার কোলে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চার্চ "সেন্ট ক্যাথরিন"। এই পাহাড়ের ওপরেই নাকি Moses স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে "10 commandments"-এর নির্দেশ পেয়েছিলেন, যা পরবর্তী কালে হয়ে ওঠে খ্রিস্ট ধর্মের অ-আ-ক-খ। এইসব জটিল information comprehend করার ক্ষমতা বা বুদ্ধিমত্তা, কোনটাই আমার নেই। যেটা ছিল, তা হোল ঐ 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখার অদম্য ইচ্ছা। 'অসাধারণ' এই কারণে যে সূর্যটা নাকি পাহাড়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে ওঠে, পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে তখন মনে হয় বুঝি পায়ের তলা থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে। দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে আলাস্কার মাউন্ট ম্যাকিনলে, কন্যাকুমারিকার ত্রি-সাগরের সঙ্গম থেকে সাউথ-আফ্রিকার Cape of Good Hope, আমার মিনেসোটার বাড়ির কাছের গ্রেট-লেক সুপিরিওর থেকে বলিভিয়ায় পৃথিবীর উচ্চতম-লেক টিটিকাকা, রাজস্থানের মরুভুমি থেকে আফ্রিকার সাহারা, অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন থেকে অস্ট্রেলিয়ার উলুরু-রক, এমনকি পেরুর অ্যামাজন জঙ্গলের মাচুপিচু-তেও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; কিন্তু তাই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে? নাঃ, তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। এইসব শুনে-টুনে দেখার 'ইচ্ছা'টা মনে একেবারে জাঁকিয়ে বসলো, লোভ আর সামলাতে পারলাম না। আর যাই হোক, এটা দেখতে গেলে আমাকে ভগবান বা ধর্ম বোঝার মতো কোনো অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে না, যা কিনা আমার একেবারেই নেই! তাই ঠিক কোরে ফেললাম এটা না দেখে আমি মিশর-দেশ ছেড়ে নড়ছি না। কিন্তু আমি ঠিক করলেই বা কি? সেখানে যাব কি কোরে? রাস্তাঘাটই যে তেমন নেই; যা আছে তা অতি নগণ্য, আর তারও বেশীর ভাগই নাকি বন্ধ। কেননা কেউই যে সেদিকে যেতে চায় না। ওদিকে নাকি পদে পদে বিপদ, যুদ্ধ সংক্রান্ত। কারণ আশেপাশের সব দেশই নাকি claim করে যে সিনাই-পেনিনসুলা তাদের, আর তাই নিয়েই যত খেয়োখেয়ি! অনেক কষ্টে একজনকে জোগাড় করা গেলো একটা private car-এ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মুশকিল হোল ভাষা সমস্যা; আমার কাছে আরবী যা, ওর কাছে ইংরিজিও ঠিক তাই, একেবারে যাকে বলে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'! তাই হাত-পা নাড়ানোই হয়ে দাঁড়ালো বোঝাবুঝির একমাত্র মাধ্যম। ঠিক আছে, তাইই সই। একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। Plan-টা ছিল মোটামুটি এই যে কায়রো থেকে সুয়েজ হোয়ে, gulf of Suez বরাবর দক্ষিণে যাওয়া আর একই পথে ফেরত আসা। অন্য কোনো

দিকে যাওয়া চলবে না। কারণ মুশকিল হোল আমার অ্যামেরিকান পাসপোর্ট। ঐ জন্যই আমাকে ইসরায়েলের গুপ্তচর বলে ভেবে বসার

সমূহ সম্ভাবনা। কারণ অ্যামেরিকাই নাকি ইসরায়েলকে ইন্ধন যোগায় । তার জোরেই ইসরায়েলের এত দাপট, আর সেই দাপটেই ওরা সিনাই-পেনিনসুলায় 'বাবু' হয়ে বসে ছিল বেশ কিছুদিন। তিন তিনবার যুদ্ধ কোরে তবেই সিনাই-পেনিনসুলার বেশ খানিকটা ফেরত পেয়েছে মিশর। এইসব তথ্য কি আর আমার মাথায় ঢোকে? আমার শুধু ঐ একটাই সম্বল ---ঐ 'ইচ্ছা'টা, ঐ 'সূর্যোদয়' দেখার 'ইচ্ছা'টা। দুপুর ১২-টা নাগাদ সেন্ট ক্যাথরিনে পোঁছানো গেল। এই চার্চে নাকি আমার মতো অপবিত্র নাস্তিকের ঢোকা বারণ। কিন্তু আমি যে অপবিত্র তাই বা কে জানছে? ভাবলাম এত দূর যখন এসেছি, ঢুকেই পড়ি না একবার, কি আর হবে । দেখি না গিয়ে, কি এমন জিনিস আছে এর ভেতরে, যা নিয়ে মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদীদের মধ্যে এত লাঠালাঠি, এত খিটকেল। কিন্তু ঐ যে বিবেক বলে কি যেন একটা আছে, তার শক্তির কাছে হেরে গেলাম । কেন জানি মনে হোল আমি এই গির্জায় ঢুকলে বাড়ি বয়ে এসে জোর কোরে কাউকে অসম্মান করা হবে। সেটা আমি পারবো না। তাই বাইরে থেকেই দেখলাম। বেশ দেখতে। অ্যামেরিকার মতো বড় আর নতুন বা 'fast' দেশে থাকলে যা হয়; ৫০০ মাইল কোন দূরত্বই নয়, আর ৫০০ বছর অনেক দিন! তাই দু হাজার বছরের পুরনো কিছু দেখতে গিয়ে দারুণ রোমাঞ্চ আর শিহরণ হোল। কিন্তু ব্যাস, ঐটুকুই। Spiritual কিছুই feel করলাম না। মনে মনে একটু হাসলাম, কোন spirit থাকলে তবে না spiritual feel করা যায়, আমার যে এসবের 'কিসুই' নেই! উল্টোদিকে ছোটো একটা টিলার ওপরে দেখলাম একদল খ্রিস্টান লোক কোন একটা 'service'-এ ব্যস্ত । ওরা যে মন্ত্র আউরাচ্ছিল, তার মধ্যে কেমন যেন একটা শান্তির বার্তা ছিল। ঠিক যেমনটা মনে হয় যখন সংস্কৃত মন্ত্র বা স্তোত্র কেউ সুন্দরভাবে পাঠ করেন । আমার ছোটবেলায় মহালয়া শুনে ঘুম থেকে ওঠার কথা মনে পড়ে গেলো, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সে কি অসামান্য দক্ষতায় স্তোত্র পাঠ! ভেবেই গায়ে কাঁটা দিলো। ওদের

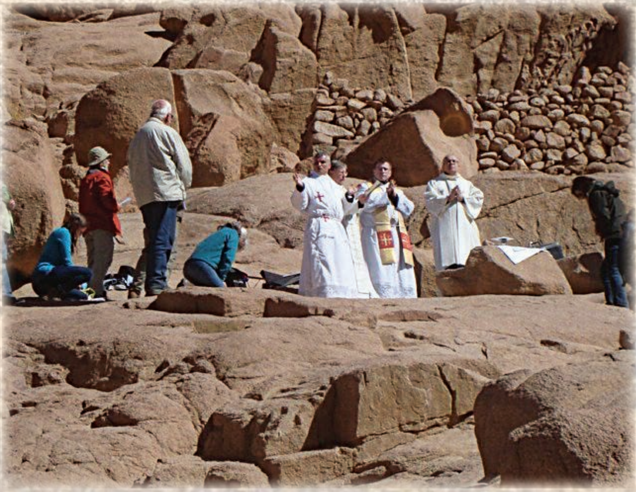

দু-এক জনের পরণে সাদা আলখাল্লার মতো কিছু একটা । হয়তো ওরাই পুরোহিত। ওদের সাথে গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করলো, তারপর ভাবলাম, না থাক, ওদের প্রার্থনা ভঙ্গ করবো না । এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম বেশ খানিকক্ষন। ভাবছিলাম ভগবান বেচারিকে নিয়ে এত মারামারি কেন? নাকি মারামারিটা আসলে জমি দখলের। সিনাই-পেনিনসুলার দখল । আমার তিন মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, ওরা যদি কোনোদিন আমাকে নিয়ে মারামারি শুরু কোরে দেয়, তাহলে আমি কোন দিকে যাব? বেচারি ভগবান, ওনার যে কি নিদারুণ অবস্থা! একজন আরব বেদুইনকেও দেখলাম, উটের পিঠে চড়ে যাচ্ছে। রোদে চটা, কালচে-তামাটে গায়ের রং, খুব রোগা

আর রুক্ষ চেহারা । গায়ে শতছিন্ন জামাকাপড়। দেখে মনে হয় বছর কয়েক স্নান করেনি । এদিকে জলই বা পাবে কোথায়? উটের পিঠেও শতছিন্ন শতরঞ্চির মতো কিছু একটা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যই বোধহয়। দেখে মায়া হোল। আচ্ছা, ওর কি বউ আছে? ছেলে, মেয়ে? তারা কি খেতে পায়? সুখ যে নেই, তা তো দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু শান্তি? সেটা কি আমার থেকে ওরই বেশী? কিছু দূরে ঘরের মতো কিছু একটা দেখা গেলো, কুঁড়েঘর আর তাঁবুর মাঝামাঝি কিছু একটা। ওরই হবে বোধহয়। এদিক-ওদিক, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও কিছু উট, গুল্ম চিবিয়ে জিরোচ্ছে। ওদের demeanor-এও কেমন যেন 'শান্তি'। দেখে মনে হোল যে এই দুনিয়ায় কি ঘটছে, না ঘটছে, তাতে ওদের বয়েই গেলো। এই আপাত 'অশান্ত' সিনাই-পেনিনসুলায় শান্তি খুঁজে পেলাম এই আমি! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ঐ 'শান্তি' দিয়েই আমার lungs দুটোকে ভোরে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম । আবার কবে যে সুযোগ হবে! কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। গাড়ির driver এসে তাগাদা লাগালো, বোললো যে এবার মাউন্ট সিনাই রওনা না হলেই নয়। নয়তো ওখানে সময় মতো পোঁছানো যাবে না, কারণ ওকে যে আবার এদিকেই ফেরত আসতে হবে রাত কাটাতে । আমি সারা রাত trek করবো; কারণ মনুষ্য সভ্যতা নাকি এখানেই শেষ! আচ্ছা, শান্তি খুঁজে পাওয়াটা কি এতই দুস্কর? যদি বা এখানে একটু সুযোগ হোল ! কি আর করা, বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যের আগেই পোঁছে গেলাম মাউন্ট সিনাই। মনে মনে একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম, পারবো তো? Driver তো আমায় পাহাড়ের কোলে ফেলে রেখে কেটে পড়বে। তারপর? কিন্তু ওখানে গিয়ে বেশ কিছু ইউরোপিও বিদেশীদের দেখে ধড়ে যেন একটু প্রাণ এলো! তারা দেখলাম সব একেবারে বিলকুল ready, trekking-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। আর আমি? সাথে শুধু একটা জলের বোতল! ঐ যে বলে না বাঙ্গালীদের কিসসু হবে না! আমিই তার হাতে-গরম উদাহরণ। এখানে নাকি এখন সব জিরোচ্ছে, খানাপিনা আর বিদেশীদের যা হয়, চুমু-চামা। দেখলাম সবই চলছে বেশ ভালো রকম। আমি কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতেই বিরক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু একা একা যে এগিয়ে যাব, সে সাহসও নেই বুকে। এখানে এসেছি তো একাই, কিন্তু তারপর থেকে এই একাকীত্বের ভয়টা কেমন যেন গ্রাস করতে শুরু করেছে আমায়। আর তার ওপর এই ইউরোপিওদের দেখে আমার অবস্থা, যাকে বলে 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া'। কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম তা হোল এরা রাত ১১-টা নাগাদ trekking শুরু করবে । ওপরে পোঁছাতে পোঁছাতে রাত ৪-টে। তার বেশী দেরী করা যাবে না, কারণ আলো ফুটতে শুরু করে দেবে। এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। শুধু জানতাম যে সকাল ৯-টার মধ্যেই আমাকে নেমে আসতে হবে, কারণ driver আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। শুনে সকলে বললো যে ওটা নাকি কোনো ব্যাপারই না, সূর্যোদয় ৬-টার মধ্যেই শেষ, তারপর নামতে ঘণ্টা আড়াই তিনের বেশী লাগবে না। মনে মনে ঠিক কোরে নিলাম যে এদের সাথেই উঠবো। রাত ১১-টা নাগাদ ওপরে ওঠা শুরু হোল। খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে, রূপসী-কিশোরী যেন। ওর রূপের ছটায় চারিদিক রুপোলী, চিক চিক কোরে চলকে পড়ছে সেই রূপ। সেই উপচে পড়া রূপের

আলোয় পথ দেখে, আর মনে মনে আমাদের সকলের প্রিয় ‘সলিলদা’র “আমরা সবাই মিলে সূর্য দেখবো বোলে” গানটা গাইতে গাইতে যখন ওপরে গিয়ে পৌঁছালাম, ততক্ষণে চাঁদ পূর্ণ যৌবনা, আর আমার অবস্থা কাহিল। ওপরে বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ঐ ঠাণ্ডাটাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো, ঠিক তাই করলাম। চাঁদের আলোটা উপভোগ করতে করতে রবীন চাটুয্যের সেই সুরটা মনে পড়ে গেলো, তালাত মাহমুদের গাওয়া “চাঁদের এত আলো”। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হোল, যোগ্যতার নিরিখে জীবনে তো কত কিছুই বেশী পেয়ে গেলাম। ভারতে জন্মানোর সূত্রে এই গানটা, আর অ্যামেরিকায় থাকার দৌলতে মাউন্ট সিনাই! একেই বলে কপাল! অন্তত আমার দাদা আর ভাইটাকে সাথে রাখতে পারলে হয়তো এতটা guilty feelings হোত না। কি আর করা যাবে, সেটাও আমার কপাল! ছোটবেলায় সহজপাঠে বা কিশলয়ে পড়েছিলাম “একা একা খেলা যায় না, ঐ বাড়ি থেকে কয়েকজন ছেলে এলে বেশ হয়”, আমার সেটাই মনে পড়ে গেলো। চাঁদের আলোটা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগলো, আর আকাশ একটু একটু কোরে পরিস্কার হতে লাগলো। আকাশের রঙ বেগুনী থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে কমলা, কমলা থেকে লাল, আর তার সাথে সাথে আরও কতরকমের নাম-না-জানা রঙের পরিবর্তন হতে হতে হঠাৎ সোনালী হয়ে গেল! তারই ফাঁকে এক মুহূর্তে পাহাড়ের তলা থেকে, আমার পায়ের তলা থেকে বেরলো একটা লাল টুকটুকে রক্তের গোলা, মুহূর্তেই যেটা আবার হয়ে গেল এক তাল সোনার দলা। মনে হোল যেন হাতে একটা লম্বা বাঁশ থাকলেই ওটাকে একটু ছুঁয়ে দেখা যেত; ওটা যেন কত কাছে, আবার কত দূরেও! তার যে কি রূপ, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, কেউই পারবে বলে আমি মনে করি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নন। সমবেত লোকজনদের মধ্যে একটা হুল্লোড় উঠল, তারপর সবাই চুপ। একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস কোরে নিলো সকলকে। আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে গেলো বেশ কিছুক্ষনের জন্য। তারই মধ্যে কিছু ছবি তোলা, আর দু-এক মিনিটের একটা video record করা। এরপর নামার পালা। নামতে গিয়ে কত কিছুই মনে এলো, এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, আমরা কেন যে এত ঝগড়া-মারামারি করি, এই সব। মাথায় একটা চিন্তা ছিলই, যদি গাড়িটা সময় মতো না আসে, কিম্বা একেবারেই না আসে? মিশরীয়দের সময় জ্ঞানের যা বলিহারি! সময়ের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে “ইনসা আল্লা”, অর্থাৎ কোনো ঘটনা সময় মতো ঘটবে কিনা, বা আদৌ ঘটবে কিনা তার পুরোটাই “আল্লা”র মর্জির ওপর নির্ভরশীল। ভারত থেকে সরাসরি এখানে এলে হয়তো এতটা চোখে পড়তো না, কারণ আমাদেরও তো ঐ একই রকম সময়জ্ঞান, যদিও আমরা সচরাচর ভগবানকে এর মধ্যে জড়াই না। কিন্তু জীবনের বেশীরভাগটাই অ্যামেরিকায় থাকার পর খুবই চোখে পড়ে, বিরক্তি লাগে, আবার হাসিও পায়। চিন্তাটা নিচে নামার সময় তাই মাথায় বেশ ভালোরকমই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু নিচে নেমে দেখি আমার গাড়ি উপস্থিত, তাতে ঢুকেই গা-টা এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না, কতক্ষন যে ঐ ভাবে কেটেছে তাও জানি না। একটা হৈ-হল্লায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো। দেখি আমার গাড়ি ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের হাতে বন্দুক, মাথায় পাগড়ী, মুখের

বেশীরভাগটাই ঢাকা, পরনে মিশরীয় ‘গালেবেয়া’। ভয়ে রক্ত একেবারে হিম হয়ে গেলো। এরা কি একেবারে মেরেই ফেলবে নাকি? মেয়ে তিনটের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তারপর সব কিছুই কেমন যেন ঝাপসা। ঘুমের ঘোরে কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো? দেখি ওরা আমার driver-টাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে। তারপরই বন্দুকধারী একজন গাড়িতে উঠে এলো, আর তন্ন তন্ন কোরে গাড়ির ভেতরটার তল্লাসি নিল। তারপর আমাকেও নামতে বললো। ভয়ে জড়সড় হয়ে, থর থর কোরে কাঁপতে কাঁপতে আমি নামলাম। আমার কাছে কিছু একটা চাইল। আমার driver আমাকে বোঝাল যে ওরা আমার ID চাইছে। আমার পাসপোর্টটা শরীরের একটা গোপন জায়গা থেকে বের কোরে ওদের দেখালাম। তখন ওরা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে করতে, পাশের একটা ছেঁড়াখোড়া তাঁবুতে ঢুকে গেলো। আমার পাসপোর্টটা নিয়েই। তার আগে আমাকে কি সব বলে শাসিয়ে গেলো, যার অর্থ একটাই হয় যে; আমি যদি এক পাও নড়ি, তো আমার জান খতম। কিন্তু নড়ে যাবই বা কোথায়? পাসপোর্ট ছাড়া? বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলো, আমার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু পাসপোর্টটা ফেরত দিলো না। উল্টে বললো জামা-কাপড়-জুতো-মোজা সব খোলো। খুললাম। জামা-প্যান্টের পকেটগুলো ভালো কোরে search করলো, জুতো জোড়াও। তারপর বললো যেটা বাকি আছে, সেটাও খুলতে হবে, অর্থাৎ আমার underwear! আমি ভাবলাম, কি বিপদ, এটা আবার কেন? ইতস্তত করতে লাগলাম। কিন্তু ওদের আরবী কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম তা হোল “অত সহজে চিঁড়ে ভিজবে না চাঁদু, তুমি ওখান থেকেই তোমার পাসপোর্টটা বার করেছ, সুতরাং ওখানে আরও কি কি লুকানো আছে তা আমরা দেখতে চাই”। আমার ড্রাইভারের দিকে আকুতি নিয়ে একবার তাকালাম, যে তুমি অন্তত এদের ভাষাটা জানো, কিছু একটা করো। কিন্তু ওর চোখের ইশারায় যা বুঝলাম তা হোল, ওরা যা যা বলছে আমার তাই করাই শ্রেয়। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এ আর এমন কি? Gym-এ গিয়ে সাঁতার কাটার পর, খেলার পর এমন তো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোরে থাকি; men’s locker room-এ সকলের সাথে উদোম হয়ে স্নান করি, দাঁড়ি কামাই। এমনটাই তো কোরে আসছি অ্যামেরিকায় যাওয়া ইস্তক! ওখানে তো এটাই রেওয়াজ । সুতরাং এতে আর ঘাবড়ানোর কি আছে? বুঝতে পারলাম যে আমার এই অ্যামেরিকান পাসপোর্টটাই এই মুহূর্তে আমার যত বিপত্তির কারণ। তাই ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমি আদতে ভারতীয়। কায়রো, আর মিশরের অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায় দিন কয়েক আগেই ঘোরার সুবাদে জানতাম যে এই মিশরীয়রা আমাদের Bollywood-এর ছবির খুব ভক্ত, TV-তে এখানে সারাদিনই হিন্দি ছবি দেখানো হয়; আরবী-subtitle সমেত। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, ভারতীয়দের ওপর বিশেষ কারো তেমন কোন রাগ নেই; যদিও এখনো আমার পাকিস্থান ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়নি। বরং, আমাদের সম্পর্কে অনেকেরই ‘শান্ত-শিষ্ট-ল্যাজ-বিশিষ্ট’ এই ধরনের একটা ধারণা আছে। তাই আমার ভারতীয়ত্ব বোঝাতে Bollywood-এর চিত্র তারকাদের নাম কোরে আবোল-তাবোল বকতে শুরু কোরলাম। হয় তাতেই কাজ হোল, নতুবা আমাকে ওদের এক বদ্ধ উন্মাদ বোলে মনে হোল; আমার ওপর ওদের সন্দেহটাই বোধহয় চলে গেল। আমার আর underwear খোলার দরকার হোল না! পাসপোর্টটা ফেরত দিয়ে পিঠে একটা চাপড় মেরে এক বন্দুকধারী বললো জামা প্যান্ট পরে নিতে। চটপট তাই করলাম। তারপর ওরা আমার ড্রাইভারের সাথে কি যেন একটা মিটিং করলো, আমার সামনেই। ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকে, সাথে যে map নিয়ে গেছিলাম, তার ওপর আঙুল দিয়ে দিয়ে আমাকে বোঝাল যে আমরা যে রাস্তা দিয়ে আগের দিন এসেছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য ঘুর-পথে ফিরতে হবে। শুধু তাই নয়, আমরা যাতে ওদের সাথে কোনোরকম ছলা-কলা কোরে অন্য কোনো রাস্তায় চলে না যাই, তার জন্য ওরা ওদের লোক পাঠাচ্ছে একটা জীপে । ওরা সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা শুধু সেই পথেই ওদের follow কোরে যেতে পারবো, নচেৎ নয়। আর বেশী ব্যাগোরবাই করলেই, ঢিসুম! সব কিছুতেই রাজি হলাম। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। একজন এসে বললো যে আমার camera-টা এখানে রেখে যেতে হবে। সে কি? তা কি কোরে সম্ভব? আমার যে মিশরের অনেক জায়গাই ঘোরা বাকি এখনো! ক্যামেরা ছাড়া চলবে কি কোরে? আমার এতো সাধের মাউন্ট সিনাইয়ের সূর্যোদয়ের ছবিগুলোও তো এরই ভেতর! কাকুতি মিনতি করলাম। কোনো লাভ হোল না। ওদের কথা হোল যে ওরা চায় না যে আমি এখানকার রাস্তা-ঘাট, চেকপোস্ট, এসবের ছবি তুলি বা সেইসব ছবি এখানকার বাইরে যাক। আমি বললাম ঠিক আছে, তাই সই। কথা দিলাম যে আমি এই তল্লাটের আর কোনো

ছবি তুলব না, আর already তোলা ছবিগুলোর মধ্যে ওদের যেগুলো পছন্দ নয়, সেগুলো delete কোরে দিচ্ছি। ওরা বললো ঐ যে সামনে জীপে আমাদের লোক তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে, ওরা কি তোমার মামা যে তোমায় ছবি delete করতে সময় দেবে? আমার দেওয়া কথার ভিত্তিতে যদিও বা camera-টাতে ছাড় দেওয়া যায়, ওর ভেতরের ছবি সমেত card-টাকে কিছুতেই ওরা এখান থেকে বেরতে দেবে না। কি করবো? ঐ card-টাতেই রফা করলাম, SD memory card-টা বার কোরে ওদের দিয়ে দিলাম। যে সূর্যোদয়ের বর্ণনা দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়; সেই সূর্যোদয়ের ছবিগুলো সমেত, সেই সূর্যোদয়ের একটা video সমেত! বুকটা ফেটে গেলো। তারপরও রেহাই নেই। ওরা জিজ্ঞেস করলো যে সাথে আর কটা card আছে? সেখানে এখানকার রাস্তাঘাট বা চেকপোস্টের ছবি তোলা আছে কিনা, ইত্যাদি। মোদ্দা কথা যা বুঝলাম তা হোল এই যে, ভালোয় ভালোয় ওরা শুধু আমার প্রাণটা নিয়েই এখান থেকে আমায় ফেরত যেতে দেবে, অন্য কিছু নিয়ে নয়। বাকি card-গুলোও দেখালাম, ওরা বুঝল যে ওগুলো empty. তারপর শুরু হোল সামনের ঐ জীপটাকে follow করা। প্রাণে ভয়, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিনাই-পেনিনসুলার সে কি অপূর্ব রূপ, যা দেখে কিনা একটা প্রাণভয়ে ভীত মানুষও মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। অবাক চোখে চারিদিক দেখছিলাম। বিভিন্ন চেকপোস্টের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। মাঝে একবার মনে হলো যে আদৌ ঠিকঠাক যাচ্ছি তো? নাকি এই সবই আমাকে ভাঙ্গিয়ে কিছু ডলার কামাবার ষড়যন্ত্র? কে জানে, আমাকে হয়তো এরা কোনো মালদার পার্টি ঠাওরেছে ! আর আমি মালদার না হলেই বা কি? অ্যামেরিকাতো বটে! একটা দম বন্ধ করা ভয় চেপে বসতে শুরু করলো বুকে। একটা মতলব এলো মাথায়। আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে একটা কিছু অন্তত রেখে যাই আমার মেয়েগুলোর জন্য, যাতে ওদের জানার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে যে ওদের বাবা কোথায় বেঘোরে প্রাণটা দিয়েছে। যেই ভাবা, অমনি কাজ। Camera-য় একটা card ভরে তাতে আমার একটা ছবি তুললাম, একটা মোক্ষম selfie! সাথে আমার ড্রাইভারেরও একটা ছবি। একটা ভিডিও রেকর্ড করলাম, কি অবস্থার মধ্যে পড়েছি তার একটা ছোট বর্ণনা দিয়ে। তারপর সেই card-টা camera থেকে বার কোরে পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। ভালো কেউ যদি এটা কুড়িয়ে পায়, এই আশায়! হঠাৎ সামনের জীপটা দাঁড়িয়ে পড়লো, সেই অনুযায়ী আমরাও। আর ঠিক তখনই আমার খেয়াল হোল যে আমি এই মাত্র ওদেরকে দেওয়া কথার খেলাপ করেছি । এই তল্লাটে আর কোনো ছবি তুলবো না বলার পরও আবার ছবি তুলেছি। আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভাবলাম এই রে, ওরা নিশ্চয়ই দূরবীণ দিয়ে আমার ছবি তোলা বা কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলার কীর্তি-কলাপ দেখেছে; এবার তার জবাব চাইবে। আমি কি জবাবদিহি করবো? এখন কি করি? জীপ থেকে দুজন বন্দুকধারী নেমে পেছনে আমাদের গাড়িটার দিকে আসতে লাগলো। আমি শুধু আমার heart beat টাই শুনতে পারছিলাম। ওরা এসে বললো যে আমরা একটা junction-এ এসে পড়েছি। ওরা আর আমাদের পথ দেখাবে না। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরলে ঘুরপথে সুয়েজ হয়ে কায়রো পৌঁছে যাব। আর কোনরকম বেয়াদবি কোরে বাঁ দিকে যাবার পাঁয়তারা কসলেই, ঢিসুম! ওরা ওদের জীপে ফেরত গেলো, কিন্তু ঠায় বসে থাকলো আমরা কোন্ রাস্তা ধরি, তা দেখার জন্য। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে মানে মানে কেটে পড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানিটা আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনের থেকেও বেশী জোরে ছুটছিল, আরও বেশী জোরে শব্দ কোরে যেন। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর, কায়রোর দিকে যাবার একটা road-sign চোখে পড়লো। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম আবার। তারপরই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করতে পারলাম যে এ যাত্রায় বোধহয় আর প্রাণের ভয় নেই! খানিকক্ষণ পরে খেয়াল হোল যে আমার গায়ের জামাটা ভিজে একশা, সপ্ সপ্ করছে ঘামে! তারই সাথে একটা অনুভূতি হোল; ঐ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার পর যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম।

(এই প্রতিবেদনের বর্ণিত ঘটনা ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের)

তবু নিশ্চুপ !

- সুমন কুমার সাহু

জানালাটা খোলাই ছিল
খেয়াল করিনি আগে !
এক হাল্কা মিষ্টি হাওয়ায়
চোখ গেল জানালার দিকে ।

জ্যোৎস্না রাত্রি ঢাকে
মেঘের আড়াল নিয়ে ---
আলো আঁধারির বেশে
নিজেই আছি দাঁড়িয়ে ।

চমকে উঠি আমি !
খানিক সামলে জিজ্ঞেস করি;
ওখানে কি করছো ?
"তুমি", না মানে "আমি"!

স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছে
আমায়
ভ্রুক্ষেপ নেই আমার কোনও
কথায় ।

আমি চিৎকার করে চেঁচিয়ে
বলি,
ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?
শুনতে কি পাচ্ছনা ---
আরে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন !

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে
আমার উদ্ভাসিত মুখ;
গভীর ভাবে দেখছে আমায়,
তবু নিশ্চুপ !

অন্তরাল

- দুহিতা সেনগুপ্ত

আড়াল চাই, নেশার আড়াল
যে আড়ালের অন্ধকারে
আমিতে নেই আমি
পথ হারালে যে পথ আসে
শুধু সেই পথগামী ।।
কান্না চাই, গাল ভেজানো
Lacrimal—এর নয়
মেনে নেওয়া সুখ, মনে নেওয়া নয়,
তা - দিয়েই সঞ্চয় ।।
শান্তি চাই, অনভ্যাসের
ঘড়ির প্রবেশ মানা
বিস্ময় চাই, অনাহুতের
অকারণের হানা ।।
গভীরতা চাই, ডুব দিয়ে নয়
জল থেকে মুখ তুলে
ভুলতে চাওয়া না- ভোলাদের
আবার করে ভুলে,
উচ্চতা চাই, নাগাল পাওয়ার
মুখোশ মাথা যত
নিজের সমান হওয়ার তাগিদ
তাতেই অব্যাহত ।।

নিশীথে স্বপ্নভঙ্গ

- তুষার কান্তি সেনগুপ্ত

আজি এ নিশীথে মশার দল কেমনে পশিল মশারীতল
না জানি কেমনে বিষম কামড়ে করিয়া তুলেছে লাল
ওরে ফুলিয়া উঠেছে গাল
ওরে চুলকাইতেছে ভারী
চিৎকারিয়া কহি আমি সবে তাড়া এদের তাড়াতাড়ি ।
প্রাণের সুখেতে কামড় কাটি গায়ের উপর যাচ্ছে বসে
থামিয়া থামিয়া দু হাতের চাঁটি ধ্বনিয়া উঠিছে দারুণ রোষে
কামড়ের চোটে পাগলের প্রায় চাঁটি মারি শেষে এর ওর গায়
মধ্যরাত্রে ছাদেতে দাঁড়াই খুলিয়া ছাদের দ্বার ।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন
ছাদেতে কামড় আরও বেশী যেন ।
সব শেষে আমি মনস্থির করে স্প্রে করি সারা ছাতে
আমি ঘোষণা করিব পুরস্কার দিব মশা যারা মারবে হাতেনাতে
আমি জ্বলনে পাগলপারা
আমি পণ করি রাত সারা
আমি জগৎ জুড়িয়া বেড়াব গাহিয়া
তাড়া মশাদের তাড়া ।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ অবলম্বনে)

দেশের নেতা

- নমিতা চন্দ

ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন দাদা
এবার ভোটে জিতলে রাস্তায় হবেনা কাদা ।
গ্রামেগঞ্জে জ্বলবে আলো, দেব জলের কল
বেকারদের চাকরি দেব, এই আমার পণ ।

কলকারখানা খুলবে আবার সবাই কাজ পাবে
যেখানে চলেনা মানুষ সেখানে রাস্তা হবে ।
আয় রে তপন, আয় রে স্বপন, আয় রে ভাই কালু
কেরোসিনের দাম কমাবো, কমবে পটল আলু ।

রেলের ভাড়া বাড়বেনা আর , থাকবেন সবাই সুখে
চুরি করলে মারবেনা কেউ, থাকতে হবেনা জেলে ।
আপনারা সবাই শুনে রাখুন, শুনুন আমার কথা
আর কোনও চিন্তা নেই, আমিই হব দেশের নেতা ।।

আমার ছেলেবেলার পূজা

- পূর্ণিমা ঘোষ

আমার গাঁয়েই শুরু আমার প্রথম দুর্গাপূজা
ঢাকের বাদ্যি কাঁসর ঘন্টা, ছিল কত মজা ।
মজার কথা বলতে গেলে হবে নাকো শেষ
মনের পাতায় ভরে আছে সুখস্মৃতির রেশ ।

শরৎ এলেই হ'ত শুরু মোদের প্রতিমা গড়া;
এক প্রস্ত, দু প্রস্ত শেষে মাটির কাজ সারা ।
পূজা এলেই পাড়ার সবাই, মাত্‌তো সাফাই কাজে
দুর্গা দালান, ঘরবাড়ি সব সাজাতো নব সাজে ।
বের হ'ত সব বাসনপত্র, ছোট বড় তাড়ু
শুরু হ'ত মিষ্টি গড়া রকমারি নাড়ু ।

মোদের কোনও ছিলনা কাজ, শুধুই হুড়োহুড়ি;
বড় পরিবার, মোরা তো নই শুধুই জনা কুড়ি ।
কত দাদু, কত ঠাকুরমা, কাকা জ্যাঠার দল
মিলতো যখন জমতো মজা হ'ত কোলাহল ।

আসতো নতুন জামা কাপড়, আসতো সবার জন্যে
নতুন সাজে, নতুন বেশে ভাসতো সবে আনন্দে ।
কোন্ জামাটা পরবো কবে, কবে কোন্ দিনে
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী না দশমীর দিনে ?

ঘুম হ'ত না ভাল ক'রে মহালয়ার রাতে
এই বুঝি হয় ভোর, থাকতাম সেই অপেক্ষাতে ।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠ, আগমনীর গান,
রেডিওতে বাজতো যখন, জেগে উঠতো প্রাণ ।
শুরু হ'ত দিন গোনা, কখন শুরু বোধন ?
পূজার ব্যস্ততায় কাটতো সময় মন্ডপে সারাক্ষণ ।

দেখেছি মায়ের চক্ষুদান, পরতে ডাকের সাজ
লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিকের বেশবাস ।
মার অঙ্গে অলংকার, পরণে লাল শাড়ী
মার দশ হাতে দশ অস্ত্র, অস্ত্র রকমারি ।
সিংহবাহিনীর পায়ের নিচে অসুরের অবস্থান
ছোট্ট মনে দাগ কেটেছে, তাও ছুঁয়েছে প্রাণ ।

বৈদিক মন্ত্রে, হোম যজ্ঞে, জাগতো ভক্তিভাব
ধূপের গন্ধ, শঙ্খধ্বনি, ছিলনা কিছুরই অভাব ।
মায়ের মুখে চেয়ে চেয়ে দেখতাম সন্ধ্যারতি
মনে হ'ত চেয়ে আছেন মা বুঝি মোর প্রতি ।
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হতেন সেই শুভক্ষণে;
তাই তো স্মরি মাকে আমি সদাই মনে প্রাণে ।।

লেডি লিবার্টি

- ডঃ হেমন্ত কুমার সরকার

আমি আলোকবর্তিকা তুলে ধরলাম
সেই সোনালী দরজার সামনে,
আশা ও স্বপ্নে ঢাকা
সেই সোনালি দরজার সামনে ---
আর বললাম, "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা!
তুমি এখনও আমার সঙ্গে আছো তো"?

হাওয়ায় এক ঝলক ঢেউ তুলে
লেডি লিবার্টি হেসে উঠলেন ।
তাঁর ডান হাতে মশালটা উঁচুতে ওঠানো
রৌদ্র, ঝড়, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে
বছরের পর বছর
একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি ---
স্বাধীনতা, আশা, মুক্তি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে ।

হাওয়ায় এক ঝলক ঢেউ তুলে
লেডি লিবার্টি আবার হেসে উঠলেন---
"স্বাধীনতা ! সে তো আমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে"।

লোহার কাঠামোতে কোথাও জঙ্গ পড়েছে,
ব্রঞ্জের ত্বকে ফাটল ধরেছে,
তবু ওই স্বাধীনতার মশাল
আজও আছে আকাশকে ছুঁয়ে ।
হাওয়ায় ঝিরঝির হাসির শব্দ তুলে
লেডি লিবার্টি বললেন, "স্বাগতম বন্ধু"!

আমার হাতের আলোকবর্তিকা তুলে ধরলাম
আবার সেই সোনালী দরজার সামনে ---
এ আলো নিভবে না কখনও ।।

ত্রিপোলিতে দোসরা জুন

- জ্যোতির্ময় রায়

আকাশ পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে
আর একবার ভূমধ্য সাগরের জলে
নীল রং মেখে উড়ে এলো
অনেক দূরের সব দিনগুলো
উত্তাপ নিয়ে, বার বার ঢেউ তুলে ।

বালুচর জাহাজের মাস্তুলের গায়,
নরম রোদের দিন সব
অন্ধকার হয়ে গলে পড়ে । সৈকতের কলরব
শেষ হয়ে যায় ।

শিরীষের শীর্ণ ডাল হৃদয় আমার
কেন যে আবার
ফেরারী দিনের সাথে ভিড় করে আসে ?
হলুদ পাতার ঝাঁক
অবিশ্রাম ঝড়ে ।
আর মনে পড়ে
অজস্র সারসের ডাক।
এই সব সাগরের পাখিদের গান শুনে
সাজানো ছায়ার মতন জাল বুনে
অশান্ত সময় ভাসে ।

তারপর রাত হলে মনে হয়
আমিও তোমার পাশে
শীতোষ্ণ হাওয়ার সাথে
আরামের চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকি ঘাসে ।।

অর্থ-নীতি

- বিশ্বনাথ পাল

অর্থনীতির অর্থটা মোরা রাখি
নীতিটা বরং তোমার জন্য থাক
মোদের বাজারে অর্থই মাপকাঠি
নীতির কথা যায় চুলোয় যাক ।

তৃতীয় বিশ্ব-আরব দুনিয়া বসো দেখি পাশাপাশি
দেখাবো আমরা ইন্দ্রজালের খেল,
কাজ কি তোমার টাকা নিয়ে রাশি রাশি
মিথ্যে তোমার ভাঁড়ার ভর্তি তেল,
তার চেয়ে বরং তেল মোদের দিয়ে,
নাও না নেবে কত চাই গুলি গোলা,
তোমরা সবাই দেশে দেশে, ভায়ে ভায়ে,
করবে কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ।

রসদ যা লাগে আমরা যুগিয়ে যাবো-
মোদের ভাঁড়ারে অস্ত্র আছে মেলা,
মিসাইল রকেট আর কি কি নেবে ভাবো-
তোমার আকাশে দেখবে আলোর খেলা ।
ভাবছো দেশটা উঠবে বোধহয় লাটে,
মরবে মানুষ গুঁড়োবে যে ঘরবাড়ি,
আহা ! তা নিয়ে চিন্তা কোরোনা মোটে,
রিফিউজি ক্যাম্প গড়ে দেবো সারি সারি ।
এই দেখো, আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে
বলছি বেশি কোরো না তো বাড়াবাড়ি
ইউ এন থেকে স্যাংশন দেবো সেঁটে,
চাইলে আবার অ্যাটাক করতে পারি
জান তো মোদের উন্নত কারিগরী ।
ভাঙতে চুরতে জুড়ি মেলা তাই ভার
ডেমক্রাসীর নিয়েছি যে ঠিকাদারি
ভাঙাটা মোদের প্রাথমিক অধিকার ।

আমার দেশের এত সব কারখানা
নিত্য নতুন গড়ছে মিসাইল রকেট
আজ যদি তাতে তোমরা করবে মানা
কেমন করে ভরবে মোদের পকেট ।
তাই বলি দেখো যুদ্ধটা থাকা চাই
নইলে মোদের চড়বে না ঘরে হাঁড়ি,
তোমার দেশটা উজাড় হলে ভাই
আমরা একটু টু-পাইস কামাতে পারি ।
মোদ্দা কথাটা চুপিচুপি বলি কানে
কথাটা সহজ তবে কাজ নেই বুঝে মানে
আমার দেশের অর্থনীতি বড়ই ঠাণ্ডা তাই
তোমাদের দেশে আগুন জ্বালিয়ে একটু হাত পোহাই ।।